আজ বুধবার

সুব্রত নিয়োগী

সুজন পাবলিকেশনস্
৭ বি, লেক প্লেস,
কলিকাতা—৭০০০২৯

প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩

প্রকাশক : তপন মুখোপাধ্যায়
সৃজন পাবলিকেশনস্, ৭ বি. লেক প্লেস, কলিকাতা-৭০০০২৯

মুদ্রক : ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস
৯।৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৯

নীলিমা ও আশুতোষ সেনগুপ্ত-কে

বিকাশের কলকাতা

বিকাশকে আলাদা করে চেনবার কোনো উপায় নেই। পাড়ার লোকেরা বিকাশকে চেনে অন্য কারণে। একবার সে পাড়ার এক তরুণী মেয়ের প্রেমে পড়ে যায় হঠাৎই। অথচ তার প্রেমে পড়া উচিত নয়। কারণ সে বিবাহিত। তার বউ তাকে বেশ ভালবাসে। কিন্তু বেওকুফের মত সে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখে। দেখে তার শরীরের গড়ন। জেনে নেয় তার নাম কি। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হাসে বিকাশ। মেয়েটি হাসে না। বরং মেয়েটি ভাল-মানুষের মত বাড়িতে বলে দেয় ব্যাপারটা। খবর রটে যায় পাড়ায়। পাড়ার লোকের কাছে তাই বিকাশের পরিচয় অন্যরকম।

. বিকাশের একটা ঠিকানা আছে। ঠিকানা রাখার দায়বদ্ধতা সমাজের কাছে আছে। তাই বিকাশের ঠিকানা আছে। সাধারণ ভদ্রতা ও সৌজন্যের সব চলতি নিয়ম সে মেনে চলে। মেনে চলে সামাজিক অনুশাসন। কথাবার্তার মাঝখানে সে বিকাশ নামক ব্যক্তির সমগ্র ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। যুক্তি থাক আর নাই থাক তার মত সকলে মেনে চলুক এটা বিকাশ চায়। খেলার সব নিয়ম মেনে চলে সে। সাহিত্য ও সংস্কৃতির যে প্রচলিত রীতি, সেই প্রচলিত রীতি বহির্ভূত কোন কিছুকে সে ঘৃণা করে। ছাত্র জীবনে বাম-ঘেঁষা রাজনীতি সে করেছে আর সবারই মত। পুঁজিবাদকে বলেছে আঁস্তাকুড়। পাঁচ বছর ধরে প্রতি সপ্তাহে সে লটারির টিকিট কেটেছে। নিয়ম মাফিক মিলিয়েছে খেলার ফলাফল। তথ্য কেন্দ্রে গিয়ে খেলার দিন সামনের সারিতে গিয়ে বসে থেকেছে দিনের পর দিন। জেড এ ০০৫৯৪৮ নম্বর পেয়ে সে একবার একটুর জন্য ফার্ষ্ট প্রাইজ হারিয়েছে। তবুও সে টিকিট কাটে। কেটে যায়।

খুব ভোরবেলায় খবরের কাগজঅলা খবরের কাগজ পাকিয়ে ছুঁড়ে দেয় দোতলার বারান্দায়। লোকটাকে বিকাশ চেনে না। কিন্তু সে কাগজটা আদ্যপান্ত পড়ে। এমনকি আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপনগুলো পর্যন্ত। মাঝে মাঝে বিকাশের মনে হয়, খবরের কাগজঅলা লোকটার সঙ্গে তার পরিচয় হওয়া উচিত। অন্তত একদিন ভোরবেলায় উঠে তার সঙ্গে আলাপ করা দরকার। মাসের পয়লা তারিখে যে চিরকুটটা দরজার ফোকর দিয়ে এসে পড়ে যাতে

বিকাশের নাম লেখা আছে, তাকে বিকাশ চেনে না—এটা কেমন অদ্ভুত মনে হয় বিকাশের। খবরের কাগজঅলার তার সম্বন্ধে কি ধারণা সে জানে না। খবরের কাগজঅলা তাকে চেনে এই ভাবে—লাল দোতলা বাড়ির জং-ধরা দরজার বিকাশবাবু দৈনিক একটি বাংলা চালু পত্রিকা কেনেন। রবিবার কেনেন দুটো কাগজ। একটা ইংরাজী, একটা বাংলা। সপ্তাহে একটা করে খেলার সাপ্তাহিক। মাসে একটা সিনেমা পত্রিকা।

এভাবেই বিকাশের বয়স বাড়বে। খবরের কাগজঅলার কাছে সে লাল দোতলা বাড়ীর জং-ধরা দরজার বিকাশ বাবু নামে পরিচিত থাকবে। যিনি রবিবার দুটো খবরের কাগজ কেনেন। সপ্তাহে একটা করে কেনেন খেলার সাপ্তাহিক। বউ-এর জন্যে কেনেন চলচ্চিত্র তারকাদের কেচ্ছাবিষয়ক একটি ঝলমলে মাসিক।

অফিস থেকে কোন ছুটি নেয় না বিকাশ। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর তার ছুটি পচে যায়। তার বউ তাকে বাইরে বেরুতে বলে। ছুটি নিয়ে পুরী কিংবা দার্জিলিং বেড়াতে যেতে বলে। কলকাতাকে বিকাশ ভালবাসে বলে শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়ে ওঠেনা। লাল দোতলা বাড়ির জংধরা দরজার বিকাশবাবু হয়ে খবরের কাগজঅলার কাছে বেঁচে থাকে সে। খবরের কাগজে নানা দেশের ছবি দেখে বিকাশ। কলকাতাকে সে অনেক দিন ভাল করে দেখে না। শুধু অফিস, বাড়ি আর খবরের কাগজে কলকাতার খবর তন্ন তন্ন করে খোঁজা ছাড়া তার আর কোন কাজ নেই যেন।

খবরের কাগজে কলকাতার সুন্দর সুন্দর জায়গার ছবি দেখে বিকাশ সে সব জায়গায় না গিয়েও কোথায় কিভাবে যেতে হবে বলে দিতে পারে। চিড়িয়াখানায় সে বহুদিন যায় না। না গিয়েও বলে দিতে পারে নতুন একটা ম্যাকাও এসেছে চিড়িয়াখানায়। একমাত্র উটটা মরে গেছে। চিড়িয়াখানার ভেতরে শিশুদের জন্য আলাদা একটা চিড়িয়াখানা আছে, যার ভেতরে আছে একটা বাচ্চা গণ্ডার। বিকাশের কোন সন্তান নেই বলে সে চিড়িয়াখানায় যেতে পারে না। পারে না যাদুঘরে যেতে। মিশরের প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাটের প্রিয় মমিটি দেখতে তার বড়ো লোভ হয়। মুণ্ডুকাটা কনিষ্কের মূর্তি, বিরাট তিমি মাছের ডিম, ডাইনোসেরাসের কঙ্কাল এগুলো সেই ছেলেবেলায় দেখেছে বিকাশ। এখন মনে পড়ে না।

সে জানে বিড়লা তারামন্দির বলে কলকাতায় একটা নতুন আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য

স্থান আছে। সেখানে কৃত্রিম আকাশের ছবি দেখা যায়। গ্রহমণ্ডলের ছবি ভেসে ওঠে আকাশে।

আউটরাম ঘাটে আজকাল আলোর রোশনাই। গঙ্গার পারের রাস্তার দুপাশে ফুলের কেয়ারী করা হয়েছে বিকাশ জানে। গঙ্গার বুকে আছে মুক্তাকাশ ভাসমান রেঁস্তোরা। নৌকা করে গঙ্গায় বেড়াতে ঘণ্টায় পাঁচ টাকা লাগে।

রবিবার কিংবা ছুটির দিন ট্রামে অল ডে টিকিট কাটলে সারাদিন ঘোরা যায়। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ভেতরে ঢুকতে গেলে ৫০ পয়সা লাগে। ওখানে কাচের শো কেসে মসলিন কাপড় আছে।

কেউ যদি বিকাশকে প্রশ্ন করে, দাদা, বলতে পারেন, গুরু নানক সরণীটা কোথায়, নেলী সেনগুপ্তা রোড কোন রাস্তার নতুন নাম। বিকাশের চোখ-মুখ আনন্দে চকচক্ করে। কোন রাস্তায় যেতে হবে, ডান দিকে ক-ফাল:, বা দিকে ক-পা, দক্ষিণ থেকে গেলে কত নম্বর বাস্ বা ট্রাম। উত্তর থেকে গেলে কত—এ সব হদিশ বাতলাতে পারলে বিকাশ খুশি হয়। খুশিতে তার মুখ ঝলমল করে।

ধীরে ধীরে বিকাশ কলকাতা সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠে। জব চার্নক কলকাতায় কবে এসেছিল। তখন কলকাতা একটা অজ গাঁ। কালিঘাটের মন্দিরের কাছে মনোহর ডাকাত তীর্থযাত্রীদের সর্ব্বস্ব লুঠে নিত। সে সময় পাল্কীই ছিল একমাত্র যানবাহন। কিংবা কত সালে কলকাতায় প্রথম ট্রামের লাইন পাতা হয়। গঙ্গার পারে কোথায় মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসী দেওয়া হয়েছিল। যে কেউ জিজ্ঞেস করলে সে এসব তথ্য চটজলদি দিয়ে দিতে পারত।

কিন্তু তা সত্ত্বেও লোকে তার কাছে আসত না। জিজ্ঞেস করত না কলকাতার কথা। সপ্তাহে কোন কোন দিন কতটার থেকে কতটা লোড শেডিং থাকবে—এ কথাও কেউ জিজ্ঞেস করত না। খিদিরপুর ডক থেকে দৈনিক কত জাহাজ ছাড়ে। মোহনা থেকে ছাড়ে কত। শহিদ মিনারের নিচে বাম দলের মিটিং-এ কত লোক হয়, কিংবা ডান দলের কত—এ কথাও না।

দেখে শুনে বিকাশ কেমন মুষড়ে পড়ে। আজকাল কারুর কলকাতা সম্বন্ধে জানার আগ্রহ নেই, এতে সে দুঃখ পায়। কলকাতা কেমন আস্তে আস্তে পাল্টে যাচ্ছে, বদলে যাচ্ছে তা কেউ বুঝতে চায় না। ৭।৮ বছর বাদে কলকাতার মাটির নিচ দিয়ে পাতাল রেল যাবে। ভাড়া হবে হাজরা মোড় থেকে এসপ্লানেড এক টাকা। এ তথ্য কাউকে অবাক করে না।

কলকাতায় পাঁচ তারা হোটেল পাঁচটা। এ ছাড়া আর একটা পাঁচ তারা হোটেল আছে দমদমে। সুইমিং পুল না থাকলে কোনো হোটেলই পাঁচ তারা হতে পারে না। কলকাতায় এখনও এই উনআশি সালে খুব সস্তায় তুপুরের খাওয়া মেলে। খালি ব্যাটারির খোলের উপর বসে গরম খিচুরী মাত্র চল্লিশ পয়সা। সুন্দরীর গানসহ চিকেন তন্দুরী মাত্র পনেরো টাকা।

ময়দানে ঘুর্ণিফল গাছের নিচে ছাতু পাওরা যায় একশ গ্রাম ৩৫ পয়সা। পেতলের থালায় ছাতুর সঙ্গে তুটো কাঁচা লঙ্কা ও তেঁতুলের চাটনী। তবে খাওয়ার শেষে থালা মেজে দেওয়া বাধ্যতামূলক।

এ সব তথ্য বিকাশ অনেকের চেয়ে বেশি জানে। অথচ কলকাতা সম্বন্ধে জানতে তার কাছে কেউ আসে না। খবরের কাগজে, রেডিওতে, টেলিভিশনে সে খবর প্রচারিত হয় না। সে রেডিও ষ্টেশনে টেলিফোন করে, খবরের কাগজের সম্পাদকের কাছে চিঠি লিখে কলকাতা সম্পর্কে তার জ্ঞানের কথা প্রকাশ করে। ট্যুরিষ্ট আফিসে ফোন করে তার নাম, ঠিকানা, বয়স নথিভুক্ত করে।

সে বহুদিন বিদেশের কোনো পর্যটকের জন্য বসে থাকে, যারা উই-এ কাটা পুরনো পুঁথি-টুঁতি নিয়ে নাড়া চাড়া করে তেমন গবেষকের জন্য অপেক্ষা করে, খবরশিকারী চতুর সাংবাদিকের জন্য দিন কাটায়, কিন্তু কেউ আসে না। বিকাশ ঘরের মধ্যে বসে থাকে, বউ-এর সঙ্গে খুঁটিনাটি ব্যাপারে ঝগড়া করে। দোতলার বারান্দায় খবরের কাগজ পাকিয়ে ছুঁড়ে দেয় খবরের কাগজঅলা। রবিবার ছুঁড়ে দেয় একটা ইংরাজী ও বাংলা কাগজ। সপ্তাহে একটা করে খেলার কাগজ। আর মাসে একবার করে চলচ্চিত্র তারকাদের কেচ্ছাবিষয়ক ঝলমলে মাসিক।

লাল দোতলা বাড়ির জং-ধরা দরজার বিকাশবাবু হয়ে বেঁচে থাকে সে। প্রতি সপ্তাহে কেনে লটারির টিকিট। নিয়মমাফিক মেলায় খেলার ফলাফল। সাহিত্য ও সংস্কৃতির যে প্রচলিত রীতি. সেই রীতি বহির্ভূত কোন কিছুকে সে ঘৃণা করে। পুঁজিবাদকে বলে আঁস্তাকুড়।

কলকাতায় প্রতিদিন সকালে কত লোক আসে বাইরে থেকে। কলকাতায় ভোরের প্রথম ট্রামে কেন একটা সীটও খালি থাকে না। লাল অক্ষরে 'লাস্ট কার' লেখা রাতের শেষ ট্রামের যাত্রী কারা—এ সব তথ্য জানা থাকলেও কেউ বিকাশকে পাত্তা দেয় না। তবুও বিকাশ কলকাতায় আসা কোন নতুন লোক

দেখলে তাকে জানায়ঃ কলকাতার আয়তন ৮৭৮৫৩ বর্গ কিলোমিটার, লোক, সংখ্যা প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৫০৪ জন। প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা ৮৯২, স্বাক্ষরের হার ৩৩·০৫%।

কিন্তু সবাই বিকাশকে এড়িয়ে চলে। ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসে থাকে সে। কলকাতার কথা বিকাশের মুখে বন্ধ হয়ে যায়। খবরের কাগজ পড়ে না সে। দরজায় আরো জং ধরে। খবরের কাগজঅলার নামটা জানা হয় না।

একদিন গভীর রাত্রে একাকী বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে বিকাশ। চুপিচুপি কলকাতা থেকে বেরিয়ে চলে যায় কোনো গণ্ডগ্রামে। সেখান থেকে হাওড়া মেলের টিকিট কেটে ফিরে আসে কলকাতায়। হাওড়া থেকে বাসে করে আলিপুরের চিড়িয়াখানায়, ট্রামে করে যাদুঘরে, মিনিবাস চেপে বিড়লা তারামন্দিরে। চিড়িয়াখানার নতুন অতিথি ম্যাকাওকে দেখে, যাদুঘরে দেখে প্রিয় মমিটি, দেখে বিড়লা তারামন্দিরের কৃত্রিম আকাশে চেনা গ্রহমণ্ডল।

প্রতিদ্বন্দ্বী

আমার প্রিয় দল খেলা শুরুর সঙ্গে সঙ্গে একটা গোল দিতেই আমি চিৎকার করে উঠলাম। গ্যালারী ভর্তি মানুষ দুহাত তুলে 'গোল' 'গোল' বলে চিৎকার করছে। কালো কালো ছাতা একবার খুলে একবার বন্ধ করে জয়োল্লাস জানাচ্ছে। কোথাও বা দু-একটা পটকাও ফেটে উঠল। হঠাৎ ভিড়ের ভেতর একটা মুখের দিকে চোখ পড়তেই আমি চমকে উঠলাম। ছেলেটাকে কয়েক-দিনের মধ্যে কোথাও যেন দেখেছি। কিছুতেই মনে করতে পারছি না। সেই একই ডেনিমের শার্ট, গলায় সোনালী সরু চেন, কানঢাকা পরচুলার মত নিখুঁত পরিপাটি চুল, পুরু কালো গোঁফ চেঙ্গিস খানের মতো দুপাশে ঝুলে আছে। ছেলেটা বাদাম কিনে খাচ্ছিল। প্রিয় দলের কেউ একটু ভুল খেললে অশ্রাব্য ভাষায় খিস্তি করছিল।

হঠাৎ স্মৃতি তোলপাড় করে সেদিনের ইন্টারভিউ-এর ছবিটা ভেসে উঠল। চাকরীটা যে দারুণ কিছু তা নয়। তবে সদাগরী অফিসের মাঝারী গোছের চাকরীতেও পয়সা কম নয়। তিতিরকে বিয়ে করার পক্ষে এ পয়সা যথেষ্ট। হনিমুনে নিদেন পক্ষে পুরী যাওয়াতে কোন অসুবিধে নেই। এই ছেলেটা সেদিনের ইন্টারভিউ-এ আমার একজন প্রতিযোগী। সাতজনের মধ্যে এ একজন।

দৃশ্যটা এইরকম। আমি ইন্টারভিউ দিতে একপাল্লা দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতেই দরজার ধাক্কা লেগে টুলের উপর রাখা পেতলের ফুলদানীটা ঝন্ ঝন্ করে পড়ে গেল মাটিতে। আমি আড়ষ্ট হয়ে ফুলদানীটা তুলে আবার রেখে দিলাম জায়গা মত। তারপর ঘোড়ার ক্ষুরের মত বড় টেবিলের সামনে একমাত্র চেয়ারে বসে পড়লাম। ফুলদানীটা পড়ে যাওয়ায় বড়ই অস্বস্তিতে ছিলাম। তাই নমস্কার করতে ভুলে গিয়েছিলাম। টেবিলের ওপাশে তিনজন। আমার একেবারে উল্টোদিকে একটা ধুমসো লোক। চুল ছোট করে ছাঁটা। দেখলেই মনে হয় লোকটা অবৈধ কোন কাজে লিপ্ত।

প্রথম প্রশ্ন সে করল: ডোণ্ট ইয়ু নো হাউ টু উইশ।

প্রশ্নটা শুনেই আমি কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলাম। তাই কিছু

না ভেবেই বললাম : এঁ্যা।

টেবিলের এককোণ থেকে টাক মাথা একটা লোক হড়বড়িয়ে বলে উঠল : ইজ দেয়ার এনি ওয়ার্ড ইন ইংলিশ 'এঁ্যা'।

আমি চুপ করে রইলাম।

লোকটা পাক্কা পাঁচ মিনিট বাঙালীর ইংরাজী না জানা নিয়ে বক্তৃতা ঝাড়লেন। সবভারতীয় পরীক্ষায় বাঙালীরা কেন পিছিয়ে যাচ্ছে সে বিষয়ে জ্ঞান দিলেন। ভারতের অন্যপ্রদেশের খাদ্য তালিকায় কত পার্সেণ্ট প্রোটিন, কত পার্সেণ্ট খাদ্যপ্রাণ থাকে তা নিখুঁতভাবে বলে গেলেন।

'তেরি বহিন কো—'। হিন্দীতে না বললে গালাগালিটা জমে না। তাই হিন্দীতেই লোকটাকে মনে মনে খিস্তি করলাম।

ইতিমধ্যে আমার প্রিয় দল আর একটি গোল দিয়েছে। ডেনিমের শার্ট-পরা ছেলেটা আনন্দে দু-হাত তুলে নাচছে।

ভিড় ঠেলে ছেলেটার গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমি। ছেলেটা কি আমাকে চিনতে পারছে না! ছেলেটা আমাকে আড়চোখে দেখে পকেট থেকে রিজেণ্ট কিং সাইজ বের করে ধরাল।

আশ্চর্য গত সপ্তাহেই তো আমাদের দুজনের দেখা হয়েছে। আমি যখন ওকে চিনতে পেরেছি, ওর তো না চেনার কথা নয়। কি জানি ইচ্ছে করেই হয়তো চিনতে পারছে না। তবে কি অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার পেয়ে গেছে ছেলেটা!

ছেলেটার সঙ্গে আমার কোথায় মিল, আর কোথায় অমিল তা খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলাম। ও কোথায় কোথায় আমার চেয়ে সুপিরিয়র তা খুঁজতে থাকি। ছেলেটার আমার চেয়ে স্বাস্থ্য ভাল আর আমার চেয়ে ফর্সা। বেশ ওয়েল ফেড চেহারা।

আমি হাসি হাসি মুখে ছেলেটার দিকে তাকালাম। ছেলেটা ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকাল।

বললাম : চিনতে পেরেছেন?

—কই না তো।

—একুশ তারিখে মরিসন এ্যাণ্ড কোম্পানিতে আমরা একসঙ্গে ইণ্টারভিউ দিয়েছিলাম—মনে নেই।

—হ্যাঁ, কিন্তু আপনাকে তো মনে পড়ছে না।

—ইণ্টারভিউ শেষে আমরা সাত জনে একটা চায়ের দোকানে ঢুকেছিলাম। আপনার বা দিকে দরজার ধারে যে ফর্সা ছেলেটি বসেছিল সেই তো আমি। আমার গায়ে ছিল নীল রঙের জামা।

ছেলেটা ভুরু কুঁচকে আমাকে মনে করতে চেষ্টা করল।

হঠাৎ বিপক্ষ দল একটা গোল করে ফেলতেই মাঠে হৈ হৈ চিৎকার। মাঠের মাঝখানে দমাদ্দম ইটের টুকরো পড়তে লাগল। পুলিশও লাঠি উঁচিয়ে ধেয়ে এলো গ্যালারীতে। গ্যালারীর লোকজন এদিক-ওদিক পালিয়ে যাচ্ছে। পাশে তাকাতেই দেখি ছেলেটা আর নেই। কোথায় ছিট্‌কে পড়েছে। বড্ড আফশোষ হচ্ছিল। নাম আর ঠিকানাটা জানা হলো না। ছেলেটা চাকরী পেয়েছে কি না জানার বড় আগ্রহ ছিল।

ইতিমধ্যে আবার খেলা শুরু হয়েছে। আমার চারপাশে যারা এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল তারা কেউ নেই। অন্যসব মুখের একটা ভিড় আমার চারদিকে। তার মধ্যে ছেলেটা নেই। ছেলেটাকে অনেক খুঁজলাম। আশ্চর্য কোথাও নেই। উবে গেল নাকি ছেলেটা!

ছেলেটার চেহারাটা ভেবে ছেলেটার একটা নাম দিলাম। ইন্দ্রজিত নামটা ছেলেটার চেহারার সঙ্গে বেশ মানায়। সদাগরী অফিসের মাঝারি চাকুরে হিসেবে ইন্দ্রজিত নামটা বেশ জুৎসই। আর প্রেমিক হবার পক্ষে তো কথাই নেই। নাম শুনেই অনেক মেয়ে প্রেমে পড়ে যাবে। তারপর ছেলেটার উপযুক্ত টাইটেল ঠিক করলাম। ইন্দ্রজিত নামের সঙ্গে মণ্ডল-টণ্ডল একেবারে বেমানান। তাই টাইটেল দিলাম চৌধুরী। ইন্দ্রজিত চৌধুরী। নামটা উচ্চারণ করতেই কেমন একটা আভিজাত্যের গন্ধ ভেসে আসে। ছেলেটার একটা নাম দিতে পেরে মনটা বেশ প্রসন্ন ছিল। তাই মনে মনে তাকে বললুম: থ্যাংক ইউ, ইন্দ্রজিত।

তিতিরের সঙ্গে দেখা হতে তিতিরকে বললাম গল্পটা। সবুজ ঘাসের উপর দু-হাতে হাঁটু জড়িয়ে বসেছিল তিতির। লেবানীজ হ্যাণ্ড ব্যাগটা ঘাসের উপর পড়ে রয়েছে। সুরকিরঙা শাড়ির সঙ্গে কাঁধ ঢাকা ব্লাউজ পরেছে তিতির। তিতিরের গা থেকে একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। তিতিরকে একটু বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। তিতির আমার কাছে আগের মত ফ্রি নেই যেন। তিতির আমাকে যেন কি বলতে চায়। তিতিরের হাতে হাত রাখলাম। অন্যদিন হলে তিতির আমার আঙুল নিয়ে খেলা করত। আজ একটু অন্যরকম যেন।

তিতির কি যেন একটা বলতে যাচ্ছিল, না বলে ভুরু কুঁচকে বলল : তোমার এ চাকরীটা কবে হবে প্রশান্ত ?

—হয়ে যাবে তিতির। হয়ে গেলেই কেয়াতলায় দুঘরের ফ্ল্যাট। জানলায় নীল রঙের পর্দা।

—নীল রঙের পর্দা আমার ভাল লাগে না। কেমন ডেপথলেশ মনে হয়। পর্দার রঙ হবে সাদা।

—তাই হবে। বলেই অন্ধকারে মাঠের ভেতর তিতিরকে জড়িয়ে ধরি আমি। তীব্র শব্দে গঙ্গার উপর দিয়ে একটা লঞ্চ চলে যায়। কেন জানি মনে হয় আমার বুকের ভেতর থেকেও তিতির অন্য কারো কথা ভাবে। আগে সিগারেট খাওয়া পছন্দ করত না একেবারে। এখন পুরুষদের সিগারেট খাওয়াকে ম্যানলীনেশ বলে ভাবে। পুরুষদের শরীরে তামাকের গন্ধ পেলে উদ্দীপ্ত হয়। তিতিরের হ্যাণ্ড ব্যাগে টুকিটাকি বিদেশী কসমেটিকস থাকে আজকাল। এনিড ব্লাইটনের মিস্ট্রি সিরিজের বই থাকে হাতে। আমি বুঝতে পারি, তিতির কি যেন আমার কাছে লুকিয়ে রাখতে চায়। অথচ জানি, তিতির আমাকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করতে পারে না। তিন বছর ধরে আমি আর তিতির গভীর ভাবে মিশেছি। আর্ট গ্যালারীতে নিয়ে গিয়ে বুঝিয়েছি টেম্পারা, ওয়াশ আর কোলাজের পার্থক্য। গদারের ছবি দেখতে নিয়ে গিয়ে বুঝিয়েছি, ফিল্মে আধুনিকতা কি জিনিষ।

সেদিন আবার দেখলাম ইন্দ্রজিতকে। ইন্দ্রজিত ডালহৌসীতে নিউ আলিপুরের মিনিবাসের লাইনে দাঁড়িয়ে। ইন্দ্রজিত-এর হাতে কালো ব্রিফ কেশ। আমি দূর থেকে দেখতে পেলাম ইন্দ্রজিত-এর পাশে দাঁড়ানো বেঁটে মত লোকটার সঙ্গে অফিস সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলছে ইন্দ্রজিত। আমি আড়াল থেকে ইন্দ্রজিত-এর কথাবার্তা শুনছিলাম। অফিসের কথাবার্তা শেষ হলে মৃদু-স্বরে দুই-একটা আন্তরিক কথা হয়। ইন্দ্রজিতের বন্ধুর শেষ কথাটা আমার কানে আসে : ইউ আর লাকি এনাফ, আফটার অল সি ইজ আ ফ্রেশি বিইচ্‌। চোখ ছোট করে ইন্দ্রজিতের বন্ধু হাসে।

আমি ডাকি : ইন্দ্রজিত-ইন্দ্রজিত।

ঠিক সেই সময় ইন্দ্রজিত-এর মিনি বাস এসে যায়। উঠে পড়ে ইন্দ্রজিত। ইন্দ্রজিতের বন্ধু আমার দিকে তাকায়। ইন্দ্রজিত তাকায় না। ইন্দ্রজিতের প্রেমিকার জন্য আমার কষ্ট হয়।

তারপর থেকে ছায়ার মত আমি ইন্দ্রজিতকে অনুসরণ করি। মরিসন এ্যাণ্ড কোম্পানীর এম. ডি কে গিয়ে বলতে ইচ্ছে হয় : যে লোকটাকে আপনারা সত্ত চাকরী দিয়েছেন, সে লোকটা ভাল নয়। ইন্দ্রজিতের বেঁটে মত বন্ধুটাকে গিয়ে বলতে ইচ্ছে হয় : আপনার বন্ধুর প্রেমিকা সম্বন্ধে ওই অশালীন মন্তব্য করা আপনার উচিত হয়নি, ইন্দ্রজিতের প্রেমিকাকে গিয়ে বলতে ইচ্ছে হয় : আপনার হবু স্বামী সম্বন্ধে আপনি এখনই সতর্ক হন।

একদিন চাব্বিশ নম্বর ট্রামের ভিড়ে সবুজ লংকার মত চকচকে মেয়ের শরীর লেপটে ইন্দ্রজিতের বেঁটে মত বন্ধুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। অস্বস্তিতে মেয়েটার মুখ লাল হয়ে গিয়েছে। ইন্দ্রজিতের প্রেমিকার জন্য আমার আবার কষ্ট হলো। লোকটা ট্রাম থেকে নামতেই আমি গায়ে পড়ে আলাপ করলাম।

- নমস্কার।

নমস্কার।

লোকটাকে চেনাই যাচ্ছে না। এতক্ষণ ট্রামের মেয়েটিকে সে অস্বস্তিতে ফেলেছিল। এখন যেন অন্য মানুষ।

—আপনি কি মরিসন এ্যাণ্ড কোম্পানীতে চাকরী করেন ?

—হ্যাঁ, কেন বলুন তো ?

—আমার এক চেনা ছেলে আপনাদের ওখানে ঢুকেছে নতুন। সেলস্ রিপ্রেজেণ্টেটিভ।

—কি নাম বলুন তো ?

—নাম জানি না। তবে ইন্দ্রজিত চৌধুরী হলে চেহারার সঙ্গে মানায়।

লোকটা চিন্তা করতে থাকে। তারপর বলে, কেমন দেখতে বলুন তো ?

—বুধবার মিনি বাসের লাইনে ওর সঙ্গে কথা বলছিলেন আপনি।

- আচ্ছা, আপনি শান্তর কথা বলছেন। ফর্সা, লম্বা, গলায় সরু চেন আছে তো ?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা।

সহজ গলায় বলল ইন্দ্রজিতের বন্ধু। অথচ কিছুক্ষণ আগেও—।

আমি দুম করে বললাম, আপনার বন্ধুর প্রেমিকা সম্বন্ধে ওই রকম অশালীন মন্তব্য করা আপনার ঠিক হয়নি কিন্তু।

লোকটা আমাকে অবাক চোখে দেখে কয়েক পলক। তারপর আমার

সঙ্গে আর একটা কথা না বলে ও সাদার্ন এ্যাভিন্যু-এর দিকে এগিয়ে যায়। যাবার আগে বলে যায়: রাবিশ।

ইন্দ্রজিতকে খোঁজা আমার বন্ধ হয় না। সেদিন বিকেল থেকে মরিসন এ্যাণ্ড কোম্পানির গেটে আমি দাঁড়িয়ে থাকি। ইন্দ্রজিৎ সেই বেঁটে মত বন্ধুটার সঙ্গে কথা বলতে বলতে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি পেছন থেকে ছায়ার মত অনুসরণ করছি। একটু পরেই ইন্দ্রজিতের বেঁটে মত বন্ধু মিনি বাসে উঠে গেল। ইন্দ্রজিত একা ব্রিফকেশ হাতে স্পায়িং এজেণ্টের মত রাজভবনের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। নতশির দুই পাথরের সৈনিকের মাঝখান দিয়ে গঙ্গার দিকে হেঁটে যাচ্ছে ইন্দ্রজিত। আমি অনেকটা তফাৎ থেকে ইন্দ্রজিতকে লক্ষ্য করছিলাম। ইন্দ্রজিত বার বার ঘড়ি দেখছে, বোধহয় সে তার প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে। দ্যাট ফ্লেশি বিইচ্।

ইন্দ্রজিত গঙ্গার পারে এসে পড়েছে প্রায়। রাস্তা দিয়ে বড বড় ট্রাক, লরী যাচ্ছে, আসছে। অতি দীন ঘোডার গাড়ি ঘণ্টা বাজিয়ে চলে গেল। কেল্লার মাঠে অল্প অল্প অন্ধকার। অন্ধকারে জোডায় জোড়ায় গৃহস্থ বাডির মেয়ের সঙ্গে বেশ্যারা বসে আছে। গঙ্গার ফুরফুরে তাজা বাতাস ভেসে আসছে। রাস্তার ওপারে গোয়ালিয়র মনুমেণ্টের নিচে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে সবুজ শাড়ি পরা। অন্ধকারে মেয়েটির মুখ দেখা যাচ্ছে না। ইন্দ্রজিত রাস্তা পার হবার জন্য থমকে দাঁড়ালো। দুপাশের গাড়ি লক্ষ্য করছে ইন্দ্রজিত। ও পাশে প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করার জন্য ইন্দ্রজিত তৎপর। ওই সবুজ শাড়ি পরা মেয়েটিই বোধ হয় ইন্দ্রজিতের প্রেমিকা। ইন্দ্রজিতের প্রেমিকাকে ইন্দ্রজিত সম্বন্ধে জানিয়ে দেয়া আমার কর্তব্য মনে হল। বলে দিতে ইচ্ছে হল, তাকে ইন্দ্রজিত ভালবাসে না। নধর কুকুরীর সঙ্গে তুলনা করলেও ইন্দ্রজিতের রাগ হয় না। ক্রোধে জ্বলে ওঠে না সে।

এগিয়ে গেল ইন্দ্রজিত। ইন্দ্রজিত মেয়েটির হাত ধরল। আবছা অন্ধকারে ইন্দ্রজিত আর তার প্রেমিকা হেঁটে যাচ্ছে। যাকে একটুও সে সম্মান করে না। মাঝে মাঝে ইন্দ্রজিতের কনুই মেয়েটির বুক ছুঁয়ে যাচ্ছে। এতদূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না ইন্দ্রজিত ইচ্ছে করেই তার বুক ছুঁয়ে দিচ্ছে কি না। ওরা দুজনে একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসল। অন্ধকারে এক জোড়া স্ত্রী-পুরুষের অবয়ব ছাড়া তাদের আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না।

আমি ধীর পায়ে ওদের কাছাকাছি একটা বেঞ্চিতে বসলাম। ওদের

কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করলাম। গঙ্গার জলে দাঁড় টানার ছলাৎ ছল শব্দ: জলের বুকে বিদেশী জাহাজ সারাই-এর নীল আলো। হঠাৎ ম্যান অব ওয়ারের সব আলো জলে উঠলো একসঙ্গে। আলোর জ্যোৎস্নায় নদী ভরে গেল।

আমি দেখলাম অল্প দূরে ইন্দ্রজিতের প্রেমিকা রূপে তিতির বসে আছে। তিতিরের চুল এলোমেলো, ব্লাউজের উপরদিককার দুটো বোতাম খোলা তিতিরের। ঘামে তিতিরের মুখ চক্‌চক্‌ করছে। তিতিরের চোখ দুটো কামনায় লাল।

আমি দুবার ডাকলাম: তিতির, তিতির।

কিন্তু আমার মুখ দিয়ে কোন শব্দ বের হল না।

তিতির আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল যেন।

ইন্দ্রজিত আমার দিকে তাকিয়েও চিনতে পারল না। ইচ্ছে হল বলি, সেই যে একুশ তারিখে মরিসন এ্যাণ্ড কোম্পানীতে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল আমার সঙ্গে কথা বলার যোগ্যতা নেই তার। যে তিতিরের সঙ্গে এরকম ব্যবহার করে তার সঙ্গে কোন কথা নেই।

তিতির নির্লজ্জের মত ইন্দ্রজিতের উরুতে হাত রাখল। ছিঃ তিতির। তিতিরের উদ্দেশ্যে একদলা থুতু ছিটিয়ে দিই এমন মনে হল। তিতিরকে আমি ভালবাসি। দয়া, মায়া স্নেহ, ভক্তি সব এক তরফা হতে পারে, কিন্তু ভালবাসা পারে কি! ইচ্ছে হল, পিছন থেকে এক ধাক্কা দিয়ে ইন্দ্রজিতকে ফেলে দিই গঙ্গার জলে। দুদিন পরে অনেক দূরে লাশ ভেসে উঠবে। ভালবাসার জন্য মানুষ তো কত কি করে।

আশ্চর্য, তিতিরের কথা ভেবেই আমি তিতিরের প্রেমিককে ক্ষমা করলাম।

টেপ রেকর্ডার

পাঁচ বছর ধরে প্রায় প্রতিবার পূজোর সময় সে একটা টেপ রেকর্ডারের কথা ভাবে। এবারের বোনাসের টাকা পেয়েই সে সটান চলে যায় মতিশীল ষ্ট্রিটে। আজ সেই দিন। নানা ধরনের ইম্পোর্টেড মডেল থেকে বেছে নেয় তার পছন্দমত সুষমাময় টেপ রেকর্ডার। কচি ধানের শীষের মত রঙ। উপরে কালো অক্ষরে জাপানী ভাষায় মডেলের নাম। নীচে ইংরাজীতে টেপ রেকর্ডারের নব ঘোরানোর জন্য ছোট ছোট নির্দেশ—আস্তে ঘড়ির কাঁটার মত ঘোরাবেন, বাঁ দিক চেপে বন্ধ করুন ইত্যাদি।

দোকানের লোকটার একটা গোবেচারা খদ্দের পেয়ে উজ্জ্বল হয় মুখ। নানা কায়দা, নানা কসরতে সে টেপ রেকর্ডারটি চালায়। আবদুল করিম খাঁর অ্যান্টিক ঠুংরী শোনায়। শোনায় ড্রাম, হাইহ্যাটস ও সিন্থেজাইজারের সম্মিলিত বাজনা।

যুবোচিত স্বভাবে তার কোমর দোলে, নিতম্ব নড়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে শুভ্রার কথা মনে হয় তার। শুভ্রার যৌন আবেদন অনেক কমে গেছে ইদানীং। শুভ্রার চেহারাটা এখন কেমন বেঢপ হয়ে যাচ্ছে। মুখটা কেমন গোলগাল, স্নেহপ্রবণ।

দোকানের লোকটা মুখে আঙুল দিয়ে চুপ করতে বলে টেপ রেকর্ডারটা 'অন' করে দেয়। স্পীকারটা মুখের সামনে ধরে কথা বলতে ইশারা করে। সে তার নামের আদ্যক্ষরটা শুধু বলে। তারপর তার ঈশ্বর বাবা-মার নাম, তার বাবা-মার বাবা মার নাম, তারপর মনে করতে চেষ্টা করে তারও আগের কোন পূর্ব পুরুষের নাম। তারপর ছাপার অযোগ্য অশ্রাব্য একটা গালাগালি দেয়। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে সে। টেপ রেকর্ডারের একটানা কুর কুর শব্দ। তারপর যেন অনেকদূরে শুভ্রা এই ভঙ্গিতে মুখে হাত দিয়ে ডাকে, শু-ভ-রা।

দোকানের লোকটা অবাক চোখে তার দিকে তাকায়। তারপর ভয়ে ভয়ে বাক্সে ভরে দিয়ে টেপ রেকর্ডারটা তার হাতে তুলে দেয়।

টেপ রেকর্ডারটা টাক্সিতে তুলতে তুলতে সে ধর্মতলার গলিত পারদের নদীর দিকে তাকায়। এর চেয়ে সুন্দর সন্ধে সে দেখেছে কি? টেপ রেকর্ডার কোলে নিয়ে সে মমত্ব নিয়ে সন্ধের দিকে তাকায়। পোস্টারে স্মিতা পাতিলকে

দেখে চোখ টেপে। মনে মনে বলে, থ্যাঙ্ক ইউ।

এই ছিল লোকটির স্বপ্ন। শুভ্রাকে চমকে দেবে। শুভ্রার চোখের কোণ থেকে নিশ্চয় কমে যাবে অবসাদ। শরীরের চড়াই-উৎরাই-এ আসবে তাজা মোরগফুলের মত নবযৌবন। সে ট্রাপিজের খেলোয়াড়ের মত দ্রুত অথচ ছিমছাম স্বভাবে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে সুরু করে। সিঁড়ি কটাকে অফুরন্ত মনে হয় তার। তারপর দরজায় নক করে।

প্রথমে ছিটকিনি পরে দরজার খিল খুলে শুভ্রা বেরোয়। তার পরনে ছিল তাঁতের কালো ও সবুজ পাড় শাড়ি।

শুভ্রাকে যতটা উদ্ভাসিত দেখবে ভেবেছিল ততটা উদ্ভাসিত হয় না শুভ্রা। বগলে টেপ রেকর্ডারের বাক্স নিয়ে শুভ্রাকে আট বছর আগের মত বললো, তুমি খেয়ে নিয়েছো তো? বলতে বলতে এমন হাসির মত মুখ করলো যে শুভ্রা তার স্বামীকে চিনতে পারলো না। সে অচেনা ভঙ্গিতে শুভ্রার কাঁধে হাত রেখে এগিয়ে যায়। কিছু কথাবার্তা হয়ঃ

—বাব্বা, তোমাকে দেখে চিনতেই পারিনি।

—কেন!

—তুমি অনেকদিন এভাবে কথা বলনি আমার সঙ্গে। টেপ রেকর্ডারটা কত দাম নিল?

—উপহারের দাম জিজ্ঞেস করতে নেই।

—তোমাকে কেমন অন্য রকম লাগছে।

—ভাল তো, আমাকে অন্য পুরুষ বলে ভাবতে পারলে তোমার ভালই লাগবে।

—যাহ্, অসভ্য!

—হা-হা-হা। তুমি আমাকে আগের মত ভালবাস?

—হঠাৎ আজ এই প্রশ্ন।

—এমনি।

—বাসি।

—মিথ্যে কথা।

—তা হলে গায়ে হাত দিলে বিরক্ত হও কেন?

—কই না তো।

শুভ্রার পুরু ঠোঁটে আঙুল ছোঁয়ায় সে।

মেঝের উপর টেপ রেকর্ডারের মোড়কটা খোলে। শুভ্রা হুমড়ি খেয়ে পড়ে টেপ রেকর্ডারের উপর। শুভ্রার আঁচল খসে পড়ে। ব্রা পড়েনি শুভ্রা। শুভ্রার শরীরের নারীগন্ধ তার নাকে লাগে। ঈষৎ যৌন-উত্তেজনা বোধ করে সে।

পরে সে টেবিল থেকে সরিয়ে ফেলে বই-এর স্তূপ, ছবিঅলা ম্যাগাজীন, ছাইদানি, ওদের বিয়েব সরলতা মাখানো মুখের ফটোগ্রাফ। টেবিলের ঠিক মাঝখানে টেপ রেকর্ডারটা রেখে সুইচে হাত রেখে সে কি ভাবে। বার্ণাডশ বলেছে, ম্যান ওভার ফরটি ইজ অ্যান ইডিয়ট। আজ তার চল্লিশ বছর পেরিয়ে তিনদিন। তারপর টেপ রেকর্ডারের সুইচ অন করে। টেপ রেকর্ডারের চাকা দুটো ঘুরতে শুরু করে।

এই শেষ যৌবনে সে প্রথম কতকগুলি বিচিত্র শব্দ করে মুখে, বিয়ের সময়কার হিট ছবির দুই-এক কলি গেয়ে ওঠে, খিস্তির ফোয়ারা ছোটায়, জিভের নিচে দু আঙুল পুরে চ্যাংড়া ছেলের মত কর্কশ স্বরে সিটি দিয়ে ওঠে।

তারপর থেকে তারা দুজনে কথা কমিয়ে ফেলে। একেবারেই চুপ করে যায় একদিন। বাড়িতে আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বান্ধব কেউ এলে শুভ্রা টেপ বাজিয়ে শোনায়। সবাই মন দিয়ে শোনে। দুই একটা মন্তব্য করে। তারপর ফিরে যায়।

এখন থেকে তারা দুজন তাদের সুখ, দুঃখ, আনন্দ, হর্ষ, বেঁচে থাকা এমনকি বিবেকও টেপ বন্দী করে রাখে।

তারা সুখী দম্পতি কিনা কেউ জিজ্ঞেস করলে শুভ্রা টেপ বাজিয়ে শুনিয়ে দেয়। ওরা আশ্বস্ত হয়। শুভ্রা এখন টেপ রেকর্ডারের কলাকৌশল শিখে গেছে। কোন নব ঘোরালে তাদের যৌবনোচিত গলার স্বর ভেসে আসবে শুভ্রা জানে। কোন সুইচে তাদের কোন বয়স শুভ্রা শিখে ফেলেছে। প্রথম দিনের রেকর্ড করা প্রথম কথাবার্তাগুলো শুনলে শুভ্রা হেসে ওঠে। তারপর আস্তে আস্তে গম্ভীর হয়ে যায়।

নানা ভুলে যাওয়া ঘটনা, বিয়ের তারিখ, এখন বসন্তকাল কিনা এসব টেপ বাজিয়ে জেনে নেয় ওরা। এইভাবেই কাটে তাদের দিনগুলো। সারাদিন টেপ রেকর্ডারের চাকা ঘুরতে থাকে। টেপ রেকর্ডারের একঘেয়ে কুর-কুর শব্দ এক সময় বিরক্তিকর লাগে। তখন টেপ রেকর্ডার বন্ধ করে দেয়। যখন বন্ধ করে দেয়, আরো বিরক্ত লাগে। তখন তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে, মারামারি করে। এ ওর পরিবারকে গালাগালি দেয়। শাপমন্যি করে। তারপর আবার এক সময় টেপ রেকর্ডারের নব নিয়ে নাড়াচাড়া করে।

এখন তাদের বদলে গেছে সবকিছু। ঘরের মেঝে, মেঝের উপর টেবিল, টেবিলে টেপ রেকর্ডারের ঘুরন্ত চাকা, নীচু খাট, বিছানা, বিছানায় অমেয় ভালবাসাবাসি।

ওরা এক সময় ঘুমতে যায়। টেপ রেকর্ডার থেকে বন্দী কথাগুলো বেরিয়ে এসে অন্ধকার ঘরে ভেসে বেড়ায়। অনেক আন্তরিক কথা তখন ওরা চুপ করে শুনতে থাকে। ওরা দুজনে বিছানার দু'পাশে ছিটকে গিয়ে মনোযোগ দিয়ে সেইসব স্মৃতিভারাক্রান্ত শব্দাবলী অনুভব করে। শূন্য বিছানায় ওই নিঃসঙ্গ দম্পতির নিঃশ্বাসের শব্দ টেপ হতে থাকে নিঃশব্দে।

টেপ রেকর্ডারের চাকা ঘোরে। ঘুরতেই থাকে অবিরাম কুর-কুর, কুর-কুর।

কাঁকড়াবিছে

আজকের দিনটা কুমুর কাছে রোজকার মতই অলস, উত্তেজনাহীন। সূর্য তখন যায় যায়। বিকেল আসছে বলে অতি দ্রুত রোদ মরে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ আগে ওয়ার্কশপের পিক আপ ভ্যান দীপককে তুলে নিয়ে গিয়েছে। কুমুর উত্তরমুখো দোতলার রান্নাঘরে রোদের তাপ কম, কিন্তু প্রচুর খোলামেলা। টেবিলে গ্যাসের উনুনের উপর প্রেসার কুকার চাপানো। উনুনের অজস্র ঝাঁঝড়ি দিয়ে সাপের মত নীলচে আগুন বেরিয়ে যাচ্ছে অবিরল। একপাশে ক্রকারী ও নানা সাইজের কৌটো। সাদা ধবধবে সিন্‌কের কল দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। কলের নীচে দীপকের এঁটো প্লেট ও গেলাস। কাঠের পাটাতনের উপর স্টেনলেশের ছুরি দিয়ে চুক্‌চুক্‌ কোপ বসিয়ে পেঁয়াজ কাটে কুমু। ঠিক সেই সময় রাস্তার উল্টোপিঠে ছোট্ট চায়ের দোকানে লোকটাকে প্রথম দেখতে পায়। এক কাপ চা নিয়ে করুণ মুখে বসে আছে লোকটা। সিনেমায় দেখা চেঙ্গিস খানের মত এক জোড়া গোঁফ ঠোঁটের দুপাশে ঝুলে রয়েছে। চায়ের চুমুকের ফাঁকে ফাঁকে লোকটা মুখ তুলে রান্নাঘরের জানলার দিকে তাকাচ্ছে ঘন ঘন। লোকটার বয়স দীপকের চেয়ে কিছু কমই হবে। স্বাস্থ্য দীপকের চেয়ে ভাল। চওড়া বুক সরু হতে হতে কোমর পর্যন্ত নেমে গেছে। রক্তরঙা কশাক শার্টের উপরের বোতাম দুটো খোলা। নীচে গেঞ্জি নেই বলে রোমশ বুকের অংশ দেখা যাচ্ছে। গলায় সোনালী চেনে লকেট। তবে লোকটার স্বাস্থ্যল চেহারার সঙ্গে করুণ মুখের অভিব্যক্তিটি বড় বেমানান।

কুমুর চোখে চোখ পড়তে লোকটা মৃদু হাসলো যেন। তারপর হাতের সিগারেট থেকে ধোঁয়ার রিঙ তৈরি করে উপর দিকে খল অভিনেতার ভঙ্গিতে ছুঁড়ে দিল।

কুমু চোখ সরিয়ে নেয়। চোখ নামিয়ে নিজেকে দেখে নিয়ে হাউস কোটের কলার দুটো টেনে দিয়ে গলা ঢাকে।

বেডরুমে ফিরে আসে কুমু। আয়নায় নিজকে একপলক দেখে। আয়নার উপর ঝুঁকে নিজের মুখটায় সমালোচনার যোগ্য পায় কেবল ওর ডিমের মত ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখ দুটো। পাশের ঘর থেকে রেফ্রিজারেটরের ফিস্‌ফিস্‌

শব্দ ভেসে আসছে। তীব্রস্বরে প্রেসার কুকারের হুইসল বেজে উঠলো। হালকা সবুজ ডিসটেম্পার করা দেয়ালে টেনিস র‍্যাকেট হাতে দীপকের হাস্যোজ্জ্বল মুখ হাসছে অনাবিল।

জানলার পর্দা অল্প তুলে নীচে চায়ের দোকানের দিকে সন্তর্পনে তাকালো কুমু। লোকটা তখনও জানলার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। ঘন ঘন সিগারেটে টান দিচ্ছে লোকটা।

পর্দার ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখে কুমু। টেলিভিসন টাওয়ার সমান উঁচুতে মরে যাওয়া রোদ্দুরের ভেতর একটা চাঁদিয়াল দুলে দুলে উড়ছে।

দলা মোচড়ানো বিছানায় দীপকের ছেড়ে রাখা জামা কাপড়। জামা কাপড়ে সিগারেট ও আফটার শেভ লোশনের তীব্র পুরুষালী গন্ধ। জোড়া বালিশ দুটোর উপর মাথার নিটোল গর্ত। গর্তে দুই-একটা চুলের টুকরো।

বিছানার একপাশে হ্যারল্ড রবিন্সের কার্পেট ব্যাগার্স। মলাটে আলিঙ্গনাবদ্ধ স্বল্পবাসা রমণী ও বৃষস্কন্ধ পুরুষ। বইটা হাতে তুলে নেয় কুমু। আমেরিকান টাইকুন জোনাস কর্ড জীবনে সফলতার চরম শিখরে পৌঁছবার জন্য একের পর এক শিল্প নিজের হাতে নিচ্ছেন। যেখানেই প্রতিরোধ তা নির্দয়ভাবে ছেঁটে ফেলছেন জোনাস কর্ড। পরিচিত হচ্ছেন মানুষের সঙ্গে। সঙ্গ পাচ্ছেন নিত্য নতুন লোভন নারী শরীরের। মেতে উঠছেন একের পর এক খেলায়। জীবনে চূড়ান্ত সফল হয়েও তৃপ্ত হচ্ছেন না কিছুতেই। আকাঙ্খিত ভালবাসা পাবার জন্য শূন্য হৃদয়ে দিন গুনছেন জোনাস কর্ড। যিনি কেবল মাত্র একটি কার্পেটের থলে সম্বল করে ভাগ্য অন্বেষণে এসেছিলেন। কুমু পছন্দ করে ঘটনার পর ঘটনার ঠাসবুনোট কাহিনী।

জানলা দিয়ে তাকিয়ে কুমু দেখে লোকটা উঠে দাঁড়িয়েছে। ঘন ঘন সিগারেটে টান দিচ্ছে লোকটা। একটা অহেতুক ভয় কুমুকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। কিন্তু কিছুক্ষণ আগেও কেমন নির্বিঘ্নে ছিল কুমু। জোনাস কর্ডের সঙ্গে সঙ্গে সেও উত্তেজনায় ভরপুর ছিল। লোকটা কি চায়! সে কি কুমুর প্রাক বিবাহিত জীবনের সেই স্খলনের ব্যাপারটা সম্বন্ধে কিছু জানে!

ঘরের জানলাগুলি দ্রুত হাতে বন্ধ করে কুমু। জানলার মুখোমুখি সেই ঝুলন্ত গোঁফের যুবকটি তখনো দাঁড়িয়ে। লোকটার মাথার উপর সিনেমার বিরাট হোর্ডিং। তাতে লাস্যময়ী সুন্দরীর রঙিন ছবি।

ড্রেসিং টেবিলের মানুষ সমান আয়নার সামনে দাঁড়ায় কুমু। কুমুর বয়স

দুরন্তভাবে বেড়ে চলেছে। সদ্য প্রিক করা ভুরুতে কোনো রঙ লাগায়নি কুমু। রঙ না লাগালে কেমন বিচ্ছিরি লাগে নিজেরই। ছাড়ানো মুরগীর মত মনে হয়। হাসে কুমু। গদী মোড়া চেয়ারে বসে হেয়ার ব্রাশ দিয়ে চুল আঁচড়াতে থাকে। মুখে ক্রীম লাগায়। ঘাড়ে গলায় ক্রীম লাগাতে লাগাতে সে নির্ভার প্রাক বিবাহ জীবনের বয়স ফিরে পায়। পুরুষের মুষ্টিতে ধরা যায় এমন স্বচ্ছন্দের সরু কোমর। চামড়ার নীচে পাখির মত নরম হাড়। যে কোনো পুরুষ তার অঙ্গুলি হেলনে সাম্রাজ্য ত্যাগ করতে পারে এমন চিন্তা তখন মন জুড়ে থাকত।

লোকটা বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে যেন। রাস্তা দিয়ে খচর মচর করতে করতে একটা ঠেলাগাড়ি যায়। লোকটা একটু থমকে দাঁড়ায়। ঠেলা গাড়িটা চলে গেলে রক্তরঙা কশাক শার্ট পরা যুবকটি এগিয়ে আসতে থাকে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে স্বরু করেছে বোধহয়। সিঁড়িতে জুতোর শব্দ। দর্পিত পায়ে দুই এক সিঁড়ি লাফ দিয়ে উঠে আসছে কোন যুবক। কুমু দু'কান সজাগ রাখে। প্রতিটি জুতোর আওয়াজ ওর কানের কাছে বোমার মত ফাটতে থাকে।

ঠিক সেই সময় ডোরবেলের তীব্র শব্দ বেজে ওঠে একবার, দু-বার, তিনবার। কুমুর গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। কুমু অসহায়ের মত দরজার দিকে এগোয়। ম্যাজিক আই-এ চোখ রাখে। দরজার ওধারে রক্তরঙা কশাক শার্ট। মুখের করুণ ভাব উবে গিয়ে দৃপ্ত একটা ভাব ফুটে উঠেছে।

কুমু ফিরে এসে সোফায় বসলো। দরজাটা তির তির করে কাঁপছে। বন্ধ দরজার দিকে কুমুর দু-চোখ। ভয়টা ধীরে ধীরে সারা শরীরে ছড়িয়ে রক্তের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে যেন।

আবার ডিংডং শব্দে ডোর বেল বেজে উঠল। কুমু নিশ্চুপ। দরজার ওপাশে একটা কম্পন অনুভব করল কুমু। তারপর একটানা ডোর বেলের আওয়াজ। কুমু দরজার দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটবার আশঙ্কায় বসে রইল।

বেল বাজলো আবার। কুমু নিশ্চল হয়ে সোফায় বসে আছে। পাগলের মত কে যেন একটানা বেল বাজিয়ে চলেছে। তারপর দরজায় এলোপাথারি লাথির শব্দ।

ধীর পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায় কুমু। কুমুর পা তার বশে নেই যেন। প্রথমে ছিটকিনি তারপর দরজার খিল খোলে কুমু। কশাক শার্ট হুড়মুড় করে বিনা নোটিশে ঘরে ঢুকে পড়ে।

লোকটা কুমুর সামনে সোফায় বসে আছে। লোকটার একটা পা পায়ের উপর তোলা। অরুচিকরভাবে পা দোলাচ্ছে লোকটা। দুটো সোফার মাঝখানে ছোট্ট টেবিল। টেবিলে একটা চায়ের কাপ। চায়ের কাপে সাদাটে সর। প্লেটের উপর ঠাণ্ডা রুপোলী চামচ। মুখ নিচু করে অপরাধীর ভঙ্গিতে বসে আছে কুমু। কুমুর বেড়ে যাওয়া নখের রঙহীন জমি, চুল, গলার ভাঁজ, হাউস কোটের ডিজাইন ইত্যাদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে লোকটা। লোকটার হাতে সিগারেটের ছাই লম্বা হয়ে বেড়ে যাচ্ছে।

উঠে দাঁড়ালো লোকটা। এ্যাশট্রেতে ছাই ঝাড়লো। লোকটা যেন কি বলতে চায় কুমুকে। লোকটাকে খুব অস্থির দেখাচ্ছে। লোকটা শিস দিতে দিতে চ্যাংড়া ছেলের মত ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। বিছানা থেকে 'কার্পেট ব্যাগার্স', তুলে নিয়ে পাতা ওল্টায়। শব্দহীন ঘরে কেবল পাতা ওল্টানোর ফর্ ফর্ আওয়াজ। লোকটার হাত থেকে মোটা বইটা মেঝেতে পড়ে যায় হঠাৎই। লোকটা নিচু হয়ে বইটা তুলে রাখে। পিছন থেকে লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে কুমু। লোকটার কার্যকলাপ দেখছে। কুমুকে বড় অসহায় দেখাচ্ছিল। আশাহীনের মত আঙুল মটকাচ্ছে কুমু। নতুন করে নখে রঙ লাগায়নি সে। বেগুনী রঙের নখের গোড়ায় ঈদের চাঁদের মত ঈষৎ গোলাপী জমি।

ড্রেসিং টেবিলের দিকে এগিয়ে যায় লোকটা। দীপকের চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়ায়। সিঁথি পাল্টে চুল দিয়ে কান ঢেকে ফেলে। মানুষ সমান আয়নার সামনে লোকটা। লোকটার পেছনে একটু দূরে হাউস কোট পরিহিত কুমু দাঁড়িয়ে। কুমুর ফর্সা মুখে সাগুদানার মত ঘামের রেখা। আয়নার ভেতর দিয়ে কুমুর দিকে তাকায় লোকটা। হাসে। বড় বড় দাঁতের ফাঁকে নিকোটিনের দাগ।

রান্নাঘরে ঢোকে কুমু। রান্নাঘরে গ্যাসের উনুনের উপর প্রেসার কুকার। তাকের উপর টুকিটাকি কৌটো, শিশি, জার। দরজার দিকে পিঠ দিয়ে কুমু। ঠিক সেই সময় রান্নাঘরে লাল লঙ্কার মত মোটাসোটা কাঁকড়া বিছেটাকে দেখতে পায় কুমু। লেজটা উঁচু করে সাঁড়াশীর মত দুই দাঁড়া নিয়ে সন্তর্পনে এগিয়ে আসছে বিছেটা। ভয় পেয়ে চিৎকার করে ওঠে কুমু। লাল কশাক শার্ট পরা লোকটা ছুটে আসে। রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে হাসে। লোকটা একবার বিছেটার দিকে আর একবার কুমুর দিকে তাকায়। তারপর ছোট্টো

কাঠের টুকরো দিয়ে বিছেটাকে মেরে ফেলে।

'যদি কামড়াতো!' কথা বলে কুমু।

'বাচ্চা ছেলেকে কামড়ালে মরেও যেতে পারে।'

প্রথম লোকটার গলা শোনে কুমু। কেমন খস্‌খসে নিরুত্তাপ। ঘাড়ের উপর হঠাৎ ঠাণ্ডা জলের ফোঁটা পড়লে যেমন হয় কুমুর তেমন মনে হলো। ভয় পেয়ে কুমু বুকের কাছে দু-হাত জড়ো করে। কুমুর চোখে ভয়ের রেশ। সুন্দর সাজানো দাঁতের ফাঁকে আঙুল। ভয়ে সরে আসতে আসতে প্রায় দরজার কাছে চলে এসেছে কুমু। লোকটা নীচু হয়ে কাঁকড়াবিছেটা সরিয়ে ফেলছে। বোতাম খোলা শার্টের ভেতর থেকে বুকের রোমশ অংশ দেখতে পাচ্ছে কুমু। লোকটার সঙ্গে কোথায় যেন অরিন্দমের মিল আছে। ঘন রোমশ বুক, দাঁতে নিকোটিনের কালো দাগ, খসখসে নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বর—এ সব কিছুই অরিন্দমের মত। অথচ অরিন্দম এখন কোথায়। শুনেছে জোনাস কর্ডের মত সেও ফুটপাথ থেকে উঠে যাচ্ছে ধীরে ধীরে উঁচু থেকে আরো উঁচুতে। উঁচুতে ওঠার নেশায় সে কুমুকে পর্যন্ত পরিত্যাগ করতে পিছপা হয়নি। এখন মাঝে মাঝে খবরের কাগজে সরকারী ডকুমেণ্টারী ফিল্মে অরিন্দমকে দেখতে পায় কুমু। অরিন্দমের চেহারা এখন অনেক মসৃণ। চোখে সাচ্ছল্যের ছটা। কুমুর খুব জানতে ইচ্ছে করে অরিন্দম বিয়ে করেছে কি না। অরিন্দমের বউ কেমন হয়েছে। ছেলেমেয়ে হলে কার মত দেখতে হয়েছে ইত্যাদি। দেখা হলে অরিন্দমকে সেই তখনকার কথা মনে করিয়ে দেবে কুমু। সেই ট্রামের টুং টাং শব্দের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাওয়া, সিনেমা হলের অন্ধকারে ঘন হয়ে বসা, যখন জীবনকে মনে হতো কি দারুণ একটা পাওয়া। এসব এখন পুরনো গন্ধের অনুষঙ্গের মত অস্পষ্ট।

লোকটা কি একটা কথা বলে। হাসে কুমু। লজ্জা পেয়ে কিশোরী মেয়ের মত মুখ নিচু করে। এক বছর আগেও মনে হতো. একদিন এমন সকাল বিকেল সন্ধে আসবে যার সঙ্গে আগের সকাল বিকেল সন্ধের কোন মিলই নেই। অবেলার অন্ধকারে চিবুক তুলে কুমু লোকটাকে নিঃশব্দে দেখে। লোকটা কুমুর এত কাছে যে লোকটার বুকের শব্দ শুনতে পাচ্ছে কুমু। কুমুর মনে হয়, সে এই ভাবেই কাটিয়ে দিতে পারে সারা জীবন।

ঠিক সেই মুহূর্তে দপ্‌ করে আলো নিভে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে ফ্ল্যাটের দরজার কড়া নড়ে ওঠে। প্রথমে আস্তে তারপর জোরে, তারপর আরো জোরে।

মোমবাতি জ্বালিয়ে কুমু দরজার দিকে এগোয়। প্রথমে ছিটকিনি তারপর দরজার খিল খোলে। দরজার বাইরে ব্রিফকেশ হাতে দীপক দাঁড়িয়ে। দীপকের টাই ধরে কাঁদতে কাঁদতে কুমু ঝুলে পড়ে। ঘরের দেয়ালে ওদের যুগল ছায়া কাঁকড়া বিছের মত কাঁপছে। টেবিলে মোমবাতি নিঃশব্দে গলে যায়।

ঘরে এসে দীপক আর কুমু লোকটাকে তন্ন তন্ন করে খোঁজে। খুঁজতেই থাকে।

রান্না ঘরের এক কোণে চিৎ হয়ে পড়ে থাকা কাঁকড়া বিছের শব ছাড়া তারা আর কিছুই খুঁজে পায় না।

বাবা অন্ধকারে বসে থাকেন

সন্ধেবেলায় যখনই অফিস থেকে বাড়ি ফিরি, দেখি সিঁড়ির নিচে বাবা বসে আছেন। আরাম চেয়ারে একাকী। বাবার চোখের পাশ কুঁচকে গেছে। বগলের নিচে হাতের থলথলে চামড়া গরুর গলকম্বলের মত ঝুলছে। আপন মনে অন্ধকারে সিগারেট খাচ্ছেন বাবা। বাবার মুখ সিগারেটের আগুনে মাঝে মাঝে ঝলসে উঠছে। বাবার চোখে বাইফোকাল চশমা। কারুর জুতোর শব্দ পেলে বাবা চোখ তুলে তাকান। ঘষা কাচের মধ্যে দিয়ে বাবার চোখের মণি তুটো ছাড়ানো লিচুর মত ঘোলাটে দেখায়। আমাকে দেখে বাবার মন মমতায় আর্দ্র হয় যেন। কাছে গেলে আমার গায়ে হাত বোলান। বাবার হাত শিরা ওঠা হাতের চেটো ফেসো ওঠা। বাবার নখের ভেতর কালো কালো ময়লা।

দোতলা থেকে আমার বউ, আমার ছেলে-মেয়ের ক্যানর ম্যানর ভেসে আসে। মাঝে মাঝে বিরক্তিতে মুখ কোঁচকান বাবা। ইংরাজ রাজত্ব কত ভাল ছিল তার গল্প করতে ভালবাসেন। যদিও বাবা এককালে অনুশীলন পার্টিতে ছিলেন। লাঠি ঘোরাতে পারতেন ভাল। লাঠি ঘুরিয়ে ইষ্টক বৃষ্টি ঠেকাতেন।

বাবার ঠাকুর্দার গল্প করতে পারলে বাবার মুখ অহঙ্কারে চক্ চক্ করে। নীলকর সাহেবের দেওয়ান ছিলেন বাবার ঠাকুর্দা। নীল শ্রমিকের প্রতি তুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে তিনি চাকরী ছেড়েছিলেন। অত্যন্ত জেদী পুরুষ ছিলেন তিনি। তার স্ত্রী ছাড়াও একটা বাঁধা মেয়েমানুষ ছিল।

বাবা বিশ্বাস করেন, কোন জাতীয় নেতার চরিত্র স্খলন হওয়া উচিত নয়। নৈতিকতার মূল্য বাবার কাছে অপরিসীম। দেশের নৈতিক বিচ্যুতির সম্বন্ধে তিনি খবরের কাগজে চিঠি লেখেন ইংরাজীতে। বাংলা ভাষায় কোন ভাবগম্ভীর রচনা লেখা যেতে পারে তা উনি বিশ্বাস করেন না।

বাবার বাঘের থাবাঅলা পায়ার একটি উঁচু চেয়ার, একটা আল পাকার কোট ও পালিশ বিহীন এক আয়না মৃত্যুর পর কে পাবে তা আমি, আমার

বোন ও আমার বউ-এর মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে দিয়েছেন।

ইদানীং বাবা হিসি চাপতে পারেন না। ভোর চারটেয় ঘুম থেকে উঠলেও সকাল দশটার আগে তার জল থাবার খাবার সময় হয় না। দরজা জানালা না খুলে অন্ধকারেই বসে থাকেন।

মোটা খাঁকি জিনের ঢোল্লা পাজামা আর হাঁটুতক লম্বা আলখাল্লা বাবার পোশাক। বাইরে বেরুলে বাবা একটা গামছা জড়িয়ে নেন গলায়। কেন কেউ জানে না। সেইজন্য পাড়ার ছেলেরা বাবার পিছনে লাগে। এক এক সপ্তাহে বাবার একটা সব্জীর উপর ঝোঁক হয়। সাঁতরা গাছির ওল, কিম্বা কাটোয়ার ডাঁটা। যেটাই খেতে ইচ্ছে হয় অনেক বাজার ঘুরে সেটা নিজেই সংগ্রহ করে আনেন। পঞ্চাশ বছর ধরে বাবা ভাতের শেষে একটু দই খান। তিনি বই পত্তর দেখিয়ে প্রমাণ করে ছেড়েছেন এতে হার্টের অসুখকে ঠেকানো যায়।

সারাদিন টুকিটাকি ওষুধ খান বাবা। নানা রকম কবিরাজি গুলি, টোটকা, হাকিমী অশ্বগন্ধা হালুয়া। বাবার হাতের কাছেই থাকে নানা ধরনের টিন, কৌটো। তাতে কোনোটায় থাকে বিস্কুট, কোনোটায় মুড়ি কিংবা লজেন্স। চলতে ফিরতে বাবার মুখ চলে। আমার ছেলে বা মেয়ে কেউ সামনে পড়লে বাবা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চিবুতে থাকেন। আমার ছেলে-মেয়েরা অবাক চোখে বাবাকে দেখে, তারপর দৌড়ে পালিয়ে যায়।

আমার মনে আছে, ছোট বেলায় আমার অসুখ করলে বাবা আমার পাশে বসে রাত জাগতেন। সারাদিনের ক্লান্তির পর মাকে বিশ্রাম দিতেন একটু। মৃদু আলোয় বাবা গারিবল্ডির লেখা পড়তেন। পড়তে পড়তে বাবার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

এখন বাবা বেশির ভাগ সময় চুপ করে বসে থাকেন। কিম্বা শুয়ে শুয়ে পা দোলান। বাবার শীর্ণ চেহারা দেখলে বুকের মধ্যে কষ্ট হয়।

বাবা ভালো তারসানাই বাজাতে পারতেন। সেকালে নল-দময়ন্তী যাত্রায় যম রাজার সঙ্গে দময়ন্তীর কথোপকথনের সময় উঁচু গ্রামে তার সানাই বাজিয়ে আধুনিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। আমার ঠাকুর্দা খুব মদ খেতেন। বাবা মদ ছুঁয়েও দেখেন নি।

বাবা এখন প্রিয় আরাম কেদারায় অন্ধকারে চুপ করে বসে থাকেন। বাবার ঘোলাটে দৃষ্টি রাস্তায় গিয়ে পড়ে। রাস্তা দিয়ে দর্পিত মানুষেরা হেঁটে

যায়। আমার কাছে কেউ কেউ আসে। আমার বউ-এর কাছে আসে মেয়েরা। বাবা নিঃসঙ্গ বসে থাকেন। তার সঙ্গে কেউ কথাও বলে না। আমার ছেলে-মেয়েরা দাদুর কাছে ঘেঁষে না। দাদুর ময়লা কাপড-চোপড়ে দুর্গন্ধ পায়।

বাবার খাটের নিচে একটা ছোট্ট তোরঙ্গ আছে। খাটের নিচের অন্ধকারে বিভীষিকার মত সেটা থাকে। বাবা কখনো কখনো সেই বাক্সটা হাতড়ান। বাক্সের মধ্যে বাবার স্মৃতি আক্রান্ত নানা জিনিসপত্র থাকে। বিদেশী ট্যাঁক ঘড়ি, পাইপ, ডোমাইড কাগজে বাবা-মা'র বিয়ের সময়কার ছবি। উঁচু চেয়ারের হাতলে বাবার তাঁতিয়া টোপির মত গোঁফঅলা চেহারা, চেয়ারে মা'র ঢলঢলে মুখের ঘোমটা পরা ছবি। এর সঙ্গে আছে গারিবল্ডির বই, বহু পুরনো হিসেবের খাতা, তাতে আমার শৈশবের চুষি কাঠিরও দাম লেখা আছে।

আমার মার কাছে বাবা একটা অযোগ্য ও অপদার্থ লোক ছিলেন। রেঞ্জার্সের লটারীতে বাবার একটা দামী ঘোড়ার নাম উঠেছিল। অনেক লোক বাবার কাছে টিকিটটা কিনে নিতে চেয়েছিল। বাবা দেন নি। শেষ মুহূর্তে ঘোড়াটা নন স্টার্টার হয়ে যাওয়ায় বাবা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন। দু-দুটো ব্যাংকে বাবার জমানো টাকা ব্যাংক ফেল হওয়াতে নষ্ট হয়। এ জন্য মার কাছে গঞ্জনা সহ্য করতে হয় অনেক।

রাজা ভাত খাওয়ার জঙ্গলে নদীর ধারে বাবা একটা কচ্ছপের বাচ্চা পেয়েছিলেন। কচ্ছপের বাচ্চাটাকে বাবা বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। বাচ্চাটা বাবার বেশ পোষ মেনে গিয়েছিল। কচ্ছপের বাচ্চাটার খোলের উপর বাবা চিত্র বিচিত্র করে দিয়েছিলেন তুলি দিয়ে। কচ্ছপটা সারা বাড়ি ঘুরে ঘুরে বেড়াত। বাবা শুয়ে থাকলে বাবার বুকে পিঠে, হাতের তালুর উপর নির্ভয়ে গলা বাড়িয়ে চলত ফিরত। বাবা ওকে ঘাস, ফল মূল খেতে দিতেন। ছোট ছোট দাঁত দিয়ে কুটুস কুটুস করে ওগুলো খেয়ে ফেলত কচ্ছপের বাচ্চাটা। কিন্তু আমরা কেউ ওর কাছে গেলে খোলের মধ্যে গলা ঢুকিয়ে ফেলত।

কচ্ছপরা অনেক দিন বাঁচে। আলিপুরের জু-গার্ডেনে সিপাহী বিদ্রোহ দেখা কচ্ছপ এখনো আছে।

সেই কচ্ছপটা একদিন রাত্তির বেলা বাবার আঙুলে কামড়ে দিয়ে কোথায় যে পালিয়ে যায় কেউ জানে না। বাবা লণ্ঠন নিয়ে কচ্ছপটা খুঁজতে বের হন।

কিন্তু কোথাও খুঁজে পান না।

এখন বাবা তন্ন তন্ন করে খবরের কাগজ পড়েন। ভাল লাগলে নীল পেন্সিলে তলায় দাগ টানেন। সারা শরীরে দাগা বুলনো খবরের কাগজের ভাঁজে টাকা লুকিয়ে রাখেন। সেই কাগজ আমার বউ বিক্রী করে দেয়। বাবা ভীষণ চেঁচামেচি করে শেষ পর্যন্ত চুপ করে যান। এক সময় অন্ধকারে আরাম চেয়ারে বসে সর্বস্বান্ত সদাগরের মত বসে থাকেন। বসেই থাকেন।

সময়ের ভারে ক্লান্ত আমার বাবার দিনগুলি এই ভাবেই কাটে। রাতগুলিও কাটে একই ভাবে। সকাল বেলায় উৎসুক চোখে খবরের কাগজের পাতায় নতুন খবরের আশায় হুমড়ি খেয়ে পড়েন। বাবার চোখের মণি উজ্জ্বল হয়। পরক্ষণেই ম্রিয়মান হয়ে পড়েন। কোনো খবরই বাবাকে উৎসাহিত করে না। গতকালের খবর বাবার কাছে বাসি মনে হয়। আগামী কালের খবরের কাগজের পাতাগুলি আজ ছাপা হলে হয়তো বাবাকে খুসি করা যেত।

গারিবল্ডির বক্তৃতা মানুষকে শুনিয়ে বাবা তাক লাগিয়ে দিতেন। সবাই বাবাকে তারিফ করত। কিন্তু যখনই সেখানে ইতালী, জার্মানী প্রভৃতির কথা আসত, তারা হাসতে হাসতে উঠে যেত। এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই সবই বই খুললে জানা যাবে—এ বোধ তাদের বাবার কাছ থেকে দূরে রাখত।

আমার বাবা অন্ধকারে বসে থাকেন। স্মৃতির জালে আষ্টে পৃষ্ঠে বন্দী থাকেন। হঠাৎ হঠাৎ আমার নাম ধরে ডেকে ওঠেন। এই কার্তিক মাসটা কোনো মতে টিঁকে গেলে আরো এক বছরের মত নিশ্চিন্ত। বাবার বাবা কার্তিক মাসে মারা গিয়েছিলেন। তার বাবাও কার্তিক মাসে। তাই কার্তিক মাসটাকে ভয় পান বাবা। কার্তিক মাস যত এগিয়ে আসে বাবা আরো চুপচাপ হয়ে যান। খাওয়া দাওয়া কমিয়ে দেন। ওষুধের মাত্রা বাড়িয়ে দেন তিনি। কালো সাদা নানা কিসিমের বড়ি টপাটপ গিলতে থাকেন। কার্তিক মাস পর্যন্ত কোন ক্রমে টিঁকে থাকা। বাবা দিন দিন গম্ভীর হয়ে যান।

কার্তিক মাস পেরিয়ে গেলেই বাবার মুখে একটু একটু হাসির রেশ দেখা যায়। দুই-একটা কথা বলতে থাকেন। কেউ দেখা করতে গেলে তার কুশল জিজ্ঞাসা করেন। দেশের খবরাখবর নেন। লজেন্স, বিস্কুট আর মুড়ির কৌটো-গুলো আবার ভরে যায়। আবার খুঁজে পেতে সাঁতরাগাছির ওল আর কাটোয়ার ডাঁটা নিয়ে আসেন। খবরের কাগজে নীল পেন্সিল দিয়ে দাগ দেন। গারিবল্ডির বক্তৃতা বিড় বিড় করেন।

তারপর আবার একদিন আস্তে আস্তে চুপ করে যান। কথা বন্ধ হয়ে যায়। চোখের কোলে অবসাদ দেখা যায়। সমাজ জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা পীড়া দেয় তাকে। নৈতিকতার মানের অবনতির জন্য কষ্ট পান তিনি। কার্তিক মাসের অপেক্ষায় সিঁড়ির নিচের অন্ধকারে একাকী বসে থাকেন বাবা।

আজ বুধবার

আজ বুধবার। কারণ মঙ্গলবার রমার সঙ্গে গানের স্কুলের সামনে দেখা করি। দূর থেকে রমার রমনীয় শরীর দেখতে পেয়ে আমার বুকের মধ্যে বিউগল বাজতে থাকে। ক্যানারী হলুদ কোন পাখির মত প্রায় উড়ে এসে রমা আমার সামনে দাঁড়ায়। ওর ঢাকা দুই কোমল স্তনের মাঝখানে সাঁইবাবার ছবি লাগানো লকেটটায় আমার চোখ আটকে যায়। ক্যালেণ্ডারের ছবির মত ঘনিষ্ঠ হয়ে সে আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে হাঁটে। কোন কথাটা আগে বলবে তার জন্য হাঁসফাঁস করে। সিনেমার প্রোগ্রাম হয়। গরমের দুপুরে সিনেমা হলের অন্ধকারে আমি ওর উরুতে হাত দিই। আঙুলে আঙুল জড়াই। সিনেমা শেষ হলে পর্দা দেয়া কেবিনে বসে চুমু-টুমু খাই। রমা হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চুমু মুছে নেয়। কেবিনের বাইরে বসা নীতিবাগীশরা কখন বাতাস লেগে পর্দা উড়ে যাবে এই আশায় জুল জুল করে কেবিনের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর বাড়িতে ফিরে সংবাদপত্রের চিঠিপত্র বিভাগে জেনারেশন গ্যাপ সম্পর্কে চিঠি লেখে।

আজ বুধবার। একজন সতেরো বছরের যুবক দাড়িতে প্রথম ব্লেড ছোঁয়ায়। একটি বারো বছরের মেয়ে রজস্বলা হয়। আমার মা-র প্রথম চুল পাকে। বাবার চোখে বাইফোকাল চশমা ওঠে। দিদির প্রথম দাঁত পড়ে। দাদার পিঠে পেশী সংকোচন হয়।

আজ বুধবার। একজন পাওনা টাকা ফেরৎ পায়। একজন টাকা ধার দেয়।

আজ বুধবার। মেন রাস্তায় একটা ভিখিরী মারা যায়। মরা গরুর মত তার শরীরেও কাক বসে।

আজ বুধবার। শ্রমিকরা জনসভা করল। কৃষকরা রিলিফের জন্য বি. ডি. ও-র অফিস ঘেরাও করল। যাদের চাকরী আছে তারা মাইনে বাড়াবার দাবীতে ওয়ালিং করল।

উগ্রপন্থীরা বিপ্লব করতে চাইল। নরমপন্থীরা লোকসভায় সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে বোঝালো কুড়ি বছরের মধ্যে বেকারি ঘুচে যাবে। ছেলেরা বুকে বল পেল।

তারপর চুটিয়ে প্রেম করতে লাগল। আমলারা ফাইলপত্রে সেই সংখ্যাতত্ত্ব বুলডগ ক্লিপ দিয়ে সেঁটে রাখলো।

আজ বুধবার। বড়লোকরা বাজারের ভাও নিয়ে, নিজেদের মধ্যে কথা চালাচালি করল। 'পেয়ার কি ডিব্বা' ছবির নায়িকার বিশাল ছবির নিচে সাপের মত লম্বা লাইন পড়ল।

নেতারা ময়দানে গরম গরম বক্তৃতা করল। খবরের কাগজে স্টেটমেণ্ট দিল। রেডিয়োতে কথিকা পাঠ করল। টিভির ফটো তরঙ্গে তাদের বিগলিত করুণা ছবি ভেসে উঠল।

বেকাররা মিছিল করল। ছাত্ররা টুকতে দেবার অধিকার চাইল। সাত বছরের পুরনো বউরা পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে লাগল। পাঁচ বছরের পুরনো স্বামীরা ময়দানে টিউব ট্রেনের পাশে টাকা নিয়ে ছুঁকছুঁক করতে লাগলো।

আজ বুধবার। একজন ঘোড়ায় টানা ট্রাম দেখা বুড়োর গঙ্গাপ্রাপ্তি হোল। হাসপাতালে একটা ৮ পাউণ্ডের ছেলে সিজারিয়ান করে জন্মালো। উঠতি ছেলে-মেয়েরা ডায়মণ্ডহারবারে গিয়ে যৌন হুল্লোরে মেতে উঠল।

আজ বুধবার। প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি হোল। রাস্তায় জল জমল। ট্রাম বন্ধ হোল। অফিস ফেরত কেরানীরা জল ভেঙে হাঁটতে হাঁটতে সি-এম-ডি কে গালা-গাল দিল। ম্যাকনামারাকে খিস্তি করল। একটা টেলিফোন খারাপ হয়ে গেল। অপারেশন চলাকালীন হাসপাতালে কারেণ্ট অফ হয়ে গেল।

আজ বুধবার। পাড়ার মেয়েকে হিড়িক দেবার জন্য বে-পাড়ার ছেলের মাথা ফাটিয়ে দেয়া হোল। ট্রেন দুর্ঘটনায় একরাশ লোক মারা গেল। সমস্ত খবরের কাগজের প্রথম পাতায় কালো বর্ডার দিয়ে দেশবরেণ্য নেতার অবি-চ্যুয়ারী ছাপা হোল।

আজ বুধবার। দুরন্ত বেগে একটা ক্যাডবেরীরঙা মিনিবাস রাস্তা কাঁপিয়ে চলে গেল। বীরভূমের গ্রাম থেকে বাবার পিসতুতো ভাইএর চিঠি এল টাকা চেয়ে। বিকেল পাঁচটার ডালহৌসীতে লাখ টাকার লটারী জেতার মত একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল।

আজ বুধবার। তেত্রিশ নম্বর বাসের ভিড়ে সবুজ লংকার মত চকচকে

দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েকে নানা বয়সের পুরুষরা ঘিরে ধরে অসুবিধায় ফেলল।

আজ বুধবার। ময়দানের ইউরিনালে পেচ্ছাপের ভ্যাপসা গন্ধ। দেয়ালে ১০ মিনিটেই গর্ভপাতের বিজ্ঞাপন। ঝাঁঝরিতে প্রায় গলে যাওয়া ন্যাপথলিন। ময়দানে দালাল, পাহারাঅলা, ভাড়াটে মেয়ে আর ফুচকাঅলা। বাসশেডের তলায় পেঙ্গুইন পাখির মত ওয়াটারপ্রুফ গায়ে দুটো বাচ্চা মেয়ে। স্কুলের বাস ভর্তি এক ঝাঁক সাদা-মেরুন ইউনিফরম পরা কিশোরীর কিচির মিচির।

আজ বুধবার। বিদেশী নাটকের ছায়া অবলম্বনে নাটক দেখতে যাবার জন্য সংস্কৃতিবানরা ভিড় করে। লেকের বেঞ্চিতে কৃত বৃদ্ধরা নিজের ছেলে কিংবা জামাই এর গুণগান করে। তারপর কচি মেয়েদের দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। নিজেদের বয়সকালের কথা মনে করে।

আজ বুধবার। কলকাতায় জৈনরা সভা করে। মুসলমানরা কোরানশরিফ পাঠ করে। হিন্দুরা মাথা কামিয়ে মৃদঙ্গ বাজিয়ে রাধাকৃষ্ণের লীলা কীর্ত্তন করে। কালো অ্যাম্বাস্যাডার নিয়ে পাঁচজন লোক মাড়োয়ারির গদি আক্রমণ করে। ভয় দেখিয়ে তেরো হাজার টাকা নিয়ে চলে যায়।

আজ বুধবার। একজন লোক খুন হয়। একজন মৃতপ্রায় মানুষ হাসপাতালে সেরে ওঠে। একজন যুবতী সুদর্শন পুরুষের দিকে অপাঙ্গে তাকায়। একজন কিশোরী পুরুষের বেয়াদপিতে প্রথম ভ্রুকুটি করে।

আজ বুধবার। একজন কলঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে। সোনাগাছিতে সেজেগুজে মেয়েরা দরজা খুলে দেয়। খালাসী টোলায় প্রচুর মদ খেয়ে একজন মাতাল হয়। তারপর রিক্সা করে বাড়ি ফেরে। বউ পা জড়িয়ে ধরে কাঁদে। মাতালটি এক ঝটকা মেরে পা সরিয়ে দেয়। কিছু খায় না। বমি করে। পরের দিনে ভোরে বউ-এর বশংবদ হয়ে যায়।

আজ বুধবার। ভারত সভা হলে মদ্যপান বিরোধী সম্মেলন হয়। সভায় মদ্যপানের কুফল সম্বলিত পুস্তিকা বিতরণ হয়। একজন স্বামী-সোহাগীর পেটে বাচ্চা আসে। আর একজন বাচ্চার জন্য বাবার থানে ধরনা দেয়।

আজ বুধবার। সিগারেটের বাক্সে লেখা থাকে, স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস ট্যু হেলথ। তবু লোকে হাসতে হাসতে সিগারেট খায়!

ক্যাবলার মত মুখ করে লোকেরা ট্রামের পেছন দিকে চলে যায়। লেডিজ সীটে বসে। কোন মেয়ে এলে তার সামনে ঝুঁকে দাড়ায়।

আজ বুধবার। চীন ভূগর্ভে পারমানবিক বোমা ফাটায়। সারা পৃথিবীতে মিনিটে লক্ষ লক্ষ শিশু জন্মায়। কোটি কোটি লোক স্ত্রী কিংবা প্রেমিকাকে ভালবাসে। কোটি কোটি লোক বেশ্যা বাড়ি যায়।

আজ বুধবার। আমার ভীষণ হিসি পায়। অবশেষে মনুমেণ্টের ওপর উঠে প্যাণ্টের বোতাম খুলে—

তোমাকে

তোমাকে আমি চিনি। তোমার সিগারেটের ব্র্যাণ্ড আমার মুখস্থ। আমার বেডরুমে জুড়কি খাটের মাঝখানে ছোট্ট মেহগনি কাঠের জাফরি দেয়া টেবিলে কাচের ছাইদানির মধ্যে জলে ভাসা ইণ্ডিয়া কিংস-এর দুই একটা টুকরো আমি দেখেছি। আমার বালিশের উপর তীব্র পুরুষালী সুগন্ধির ঘ্রাণ আমি পেয়েছি। তুমি আমার চেয়ে লম্বা, আমার চেয়ে নিশ্চয় ফর্সা, আমার চেয়ে বেশী যৌন আবেদনময়। রীণা আমার খর্বতা নিয়ে মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে, পুরুষের চওড়া কাঁধ, নিখুঁত কামানো গালের প্রশংসা করে। তখন তোমার চেহারাটা আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

আমি বাড়ি থাকলে তোমার টেলিফোন মাঝে মাঝেই ধরি। আমার খুব পুরনো অভ্যেস ফোন আমি বাজতে দিই না। ফোনে কানেকশনের খুট্ শব্দ হলেই আমি বিছানা থেকে হাত বাড়িয়ে রিসিভার ক্রাডেল থেকে তুলে নিই। মাউথ পিস মুখে লাগিয়ে বলি, 'হ্যালো, বাগচী স্পিকিং।' ওপার থেকে কোন শব্দ ভেসে আসে না। তখনই বুঝতে পারি এ ফোন তোমার। এ ফোন রীণার প্রেমিকের। আমি আবার বলি, হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো। ওপাশ থেকে দু চারটে ফিস্ ফিস্ কথাবার্তা ভেসে আসে। কারা যেন গোপন কোন ষড়যন্ত্র করছে আমার বিরুদ্ধে। আমি আকুল হয়ে জিজ্ঞেস করি, আপনি কে? আপনার বাবার নাম? বয়স? কোন উত্তর আসে না। আমি তখন টেলিফোনের কয়েল কর্ডটা ধরে রিসিভারটাকে দোলাতে থাকি। যেমন করে লেজ ধরে মানুষ মৃত ইঁদুরকে ঝুলিয়ে নিয়ে যায়। যেন তোমাকে হাতের সামনে পেলে আমি এইভাবে ইঁদুরের মত মেরে ফেলতে পারি।

রীণা কি বুঝতে পেরেছে, ব্যাপারটা আমি জেনে ফেলেছি। তোমাদের অ্যাফেয়ার্সটা আমার কাছে আর গোপন নেই। অথচ রীণার মুখ দেখলে কিছুই বোঝা যায় না। কত সহজে অফিস যাবার সময় আমার কোট পিছন থেকে পরিয়ে দেয়। টাই-এর শেষ গিঁটটা বাঁধা হলে আদুরী হয়ে বুকে মাথা রাখে। ঠিক তখনই বলতে ইচ্ছে হয় রীণা, তোমার অভিসারের খবর আমি পেয়ে গেছি। বলতে ইচ্ছে হয়, রীণা তোমার প্রেমিককে আমি খুন করব।

বলতে ইচ্ছে হয়, তোমার সুদর্শন প্রেমিককে অন্ধকার শূন্য ময়দানে গল্প করার ছলে ডেকে নিয়ে গিয়ে পর পর পাঁচটা গুলি করব। গুলি কটা ওর শরীরের দুপাশ দিয়ে সাঁ সাঁ করে বেরিয়ে যাবে একটাও গায়ে লাগবে না। তোমার প্রেমিক যখন মৃত্যু ভয়ে আমার পা জড়িয়ে ধরবে তবে কেবল মাত্র তোমার প্রেমিক বলেই তাকে আমি ক্ষমা করব।

অথচ আমি কিছুই বলতে পারি না রীণাকে। রীণার শরীরের ঈষৎ নারীগন্ধে আমি আন্দোলিত হই। বিদায় চুম্বন জানিয়ে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে পড়ি। নিচে তখন অফিসের কালো অ্যাম্বাসাডার একটানা হর্ণ বাজিয়ে চলেছে। আমি জলজ্যান্ত ডাকাতের মত রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে গাড়িতে গিয়ে উঠি। কালো অ্যাম্বাসাডার গাড়ির অরণ্যে হারিয়ে যায়।

আমি কি খুব পজেসিভ! না হলে রীণা যখন কলেজের কোন পুরনো পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে কথা বলে আমার ভারি ঈর্ষা হয়। ঈর্ষায় আমার বুক জ্বালা করে। আমি রীণাকে চিনতে পারি না। ওর গলার স্বর অন্যরকম হয়ে যায়। হাসবার সময় বার বার বুকের উপর হাত দিয়ে আঁচল টানে অকারণ। শরীর দুলিয়ে যখন অসভ্যের মত হাসে আমার মনে হয় এক চড় মেরে ওর হাসি থামিয়ে দিই। আমি জানি ওরা কি কথা বলছে। ছন্দার সঙ্গে অরুণের বিয়ে হল কি না, কিংবা রজত ষ্টেট্স থেকে ফিরছে কবে, নিবেদিতা ডিভোর্স পেয়েছে কি না—এই সব। তারপর গলা নামিয়ে ওরা আরো দু'চারটে কথা বলে। তখন আমার সম্বন্ধে কোন কথা হয় কিংবা রীণার প্রেমিকের সম্বন্ধে।

রীণা কি তোমাকে খেলাচ্ছে। দু'রকম ভাবে মেয়েরা ছেলেদের ব্যবহার করে। এক: সামান্য যৌনতা দিয়ে পুরুষকে প্রথমে প্রলুব্ধ করে তারপর পাত্তা না দেওয়া। শেষে স্ত্রী মাকড়শার মত পুরুষকে কুক্ষিগত করা। যৌনতার কণামাত্র না দিয়ে কেবলমাত্র 'নিকষিত হেম'-এ শেষ পর্যন্ত পুরুষকে হারাতেই হয়।

প্রাণীমাত্রেই এই দস্তুর। রীণা স্ত্রী-চরিত্রের কোন আয়ুধটি ব্যবহার করছে জানলে ভাল হত।

কত সহজে রীণা ব্যাপারটা গোপন করে আছে আমার কাছে। হাজার কথার ফাঁকেও মুখ ফস্কে তোমার কথা বলে না রীণা। আমি হাবে ভাবে ওকে তোমার কথা বলতে চাই। ও কেন জানি কপট অজ্ঞতার ভান করে। অথচ আমি বেশ বুঝতে পারি, রীণা আমার কাছে কি যেন লুকিয়ে রাখতে

চায়। আবছা অন্ধকারে বিছানায় আমার পাশে শুয়ে থেকেও রীণা আর এক পুরুষের কথা ভাবে। আমি ঘুমের ভান করে রীণার দিকে তাকিয়ে থাকি। প্রায় স্বচ্ছ ছাপ তোলা নাইটিতে রীণাকে স্বপ্নের নারী বলে মনে হয়। রীণা চিত হয়ে শুয়ে ঘুরন্ত পাখার দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর চোখ দুটো ঝোপের মাঝে খুঁজে পাওয়া মার্বেলের মত চক্ চক্ করে। রীণা ওর খাটে দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে থাকে। আমি ঠিক জানি, রীণার চোখ দিয়ে দু ফোঁটা জল এইমাত্র গড়িয়ে পড়ল। এই জলটা রীণা কার জন্য ফেলল? আমার জন্য? না তার প্রেমিকের জন্য।

তোমাকে আমি চিনি। তুমি আমার স্ত্রীর প্রেমিক। রাজা নিরোর মত কোন স্বচ্ছ কাচের আধারে জলটুকু রেখে দিয়ে আমি তোমাকে উপহার দিতে চাই। আমার তরফ থেকে তোমাকে এই প্রীতি উপহার।

তোমরা দুজনে তো ষড়যন্ত্র করে আমাকে যে কোন মুহূর্তে মেরে ফেলতে পার। পার্টিতে ডেকে নিয়ে গিয়ে হুইস্কির গেলাসে ঢেলে দিতে পার তীব্র বিষ। কিংবা ঘুমন্ত অবস্থায় আমায় মাথায় লোহার হাতুড়ী মেরে আমাকে শেষ করে ফেলতে পার। বা আমি যখন কালো অ্যামবাসাডার থেকে নেমে চৌরঙ্গী রোডের চওড়া রাস্তা পেরুব ঠিক তখনই উল্টোদিক থেকে ভারি লরী এসে আমাকে চাকারতলায় পিষে ফেলতে পারে।

অনেক কিছুই মানুষ প্রেমের জন্য করে। ভালবাসার জন্য করে।

অথচ আমি জানি প্রথমদিকে রীণাকে দূর থেকে আসতে দেখে আমার যেমন বুকের মধ্যে হাইহ্যাটস বাজত, তেমনি তোমারও বাজে। তোমার শার্টের নিচে ছেলেবেলায় বাজিতে পুড়ে যাওয়া কালো কুৎসিত দগদগে দাগটাকে তুমি রীণার কাছে লুকিয়ে রাখবে। ততদিনই লুকিয়ে রাখবে যতদিন দৈনন্দিনতায় রীণা তোমার কাছে পুরনো হবে না। অতি ব্যবহারে দীর্ণ হবে না। রীণা যেদিন তোমার দিকে পিছন ফিরে অনায়াসে শাড়ি ব্লাউজ পাল্টাবে, ঘুম থেকে উঠে তোমার সামনে ব্রাশ ঘষে দাঁত মাজবে, যখন সে অনায়াসে স্যানিটারি ন্যাপকিন ফুরিয়ে যাবার কথা বলবে তোমার ভালবাসার কণামাত্র থাকবে না।

কলেজে পড়বার সময় একবার মেট্রো সিনেমার অন্ধকারে পাশে বসা রমণীর চুড়ির রিনি ঠিনি, আচমকা স্পর্শ, মেয়েলি সুগন্ধ ইত্যাদিতে আমি অত্যন্ত কামজর্জর হয়ে পড়েছিলাম। পরে আলো জ্বলতে দুঃখ কাতর হয়ে পড়েছিলাম খুব। পাশের যে মহিলার স্পর্শ-ঘ্রাণে আমি পুলকিত হচ্ছিলাম তার বয়স

পঞ্চাশের উপর। কল্পনা যে মানুষকে কতদূর নিয়ে যেতে পারে।

আমি যদি হিন্দু না হতাম আমার মৃত্যুর পর নিশ্চয় একটা স্মৃতিফলক থাকত। তাতে লিখতে বলতাম, 'এখানে রীণা বাগচীর স্বামী শায়িত আছে।' হা-হা আমার কোন পরিচয় নেই। আমার স্ত্রীর পরিচয়ে আমার পরিচয়। আমি চিন্তা করতে পারি, খিদে পেলে খেতে ইচ্ছে করে, ঘুম পেলে ঘুম। মৈথুনেও আমার অতৃপ্তি নেই। অথচ মৃতফলকের গায়ে লেখা থাকবে, 'এখানে রীণা বাগচীর স্বামী শায়িত আছে।'

স্বামী অর্থ কি? ইচ্ছে মত মৈথুনের অধিকার। না অন্য কিছু। তার বদলে স্ত্রীর ভরন পোষনের সব দায়িত্ব নেওয়া। আর প্রেমিক অর্থ? সবার অজান্তে দুজনে মিলিত হওয়া। গোপনতাই এর আনন্দ, এর সুখ। হাটের মাঝখানে এনে ফেললে প্রেমের মৃত্যু।

আমি জানি আমাকে তুমি ভাল চোখে দ্যাখো না। সর্বদাই আমার মৃত্যু কামনা কর। এখন আর কোন স্বপ্ন নেই আমার চোখে। কোন কিছু আর পাওয়ার নেই আমার। আমার নিজস্ব নারী আমি পেয়েছিলাম। তাকে নিয়ে স্বপ্নও দেখেছি। স্বপ্নহীন জীবনের ভয়ে কাঁটা হয়ে আছি দীর্ঘকাল। রীণা তোমাকে ভালবাসে। আমাকে ভালবাসার ভান। তোমাকে মন দিয়েছে! আমাকে শরীর। আসলে জীবনের অন্য নামই স্বপ্ন।

একদিন দেখা হলে বত্রিকা পাখির মত রীণা কিচির মিচির করে কত কথাই বলত। কোন কথাটা আগে বলবে তার জন্য করত হাঁস-ফাঁস। মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে বলতো, অসভ্য।

আউট্রাম ঘাটের ঝুপ ঝুপ অন্ধকারে একদিন আমি আর রীণা হাতে হাত রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতাম। অনেকদিন সারা সময়টা আমরা কোন কথাই বলিনি। কোনদিন রবীন্দ্রনাথের গান আমি দুই এক কলি গেয়ে উঠতাম। সঙ্গে সঙ্গে রীণা আমার সামনে আঙুলে ঢেউ খেলিয়ে নেচে উঠত। বেকার যুবকদের পচা চপ-কাটলেটের অত্যাচার সয়েও আমরা প্রায় রোজই ওখানে যেতাম। এখন সে সব পুরনো স্মৃতির মত অস্পষ্ট। এখন আমি কেবলই স্বামী। রীণা বাগচীর স্বামী। আমি এই ভাবেই সমাজে পরিচিত, স্বীকৃত। আমার নিজস্ব কোন অস্তিত্বই নেই। সব স্বামীর মতই আমি অতি পরিচিত। সব স্বামীর মতই আমি এক রকম। কতদিন আউট্রামে যাওয়া হয় না।

রীণার সঙ্গে আমার আজকাল খুব কম কথাই হয়। হলেও বেশির ভাগ

সাংসারিক ছোট খাট সমস্যার কথা। রীণার সঙ্গে আমার ভালবাসার কোন কথা হয় না আজকাল। মাঝে মাঝে খুব অবাক লাগে আমরা একদিন পরস্পরকে ভালবাসতাম। স্বপ্ন দেখতাম। এখন সেই স্বপ্নের কোন কিছুই অবশিষ্ট নেই আর। আমি সদাগরী অফিসের এক মাঝারি চাকুরে। নেহাৎই রীণা বাগচীর স্বামী। রীণার কাছাকাছি হলেই রীণা আজকাল বিরক্ত হয়। নানা অজুহাতে আমাকে তার কাছে ঘেঁষতে দেয় না। একদিন দমকা হাওয়ার মত আমার জীবনে এসেছিল রীণা। তাকে মনে হয়েছিল, সে আর পাঁচটা মেয়ের মত নয়। একেবারে আলাদা। আজ তোমার যা মনে হচ্ছে রীণাকে, আমার সেদিন তেমনি মনে হয়েছিল। রেজিষ্ট্রি করে বিয়ে হল। যারা বিয়ের সাক্ষী দিয়ে ছিল তারা এখন কোথায় আছে জানি না। যৌন উন্মাদনার জোয়ারে প্রথম বছর বিবাহিত জীবন ভালই কাটল। তারপরই আমার রীণা সম্বন্ধে ঘোর কাটতে সুরু করল। আমার কাছে রীণার কি যেন একটা দাবী আছে। আমি আজও ভাল করে বুঝতে পারিনি সেটা কি। এখন আমাদের সম্পর্ক কেমন যেন শীতল। বাইরের বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজনের কাছে আমরা সেটা বুঝতে দিই না। বোধ হয় একমাত্র তুমিই জান আমাদের সম্পর্কের কথা। সবার সামনে আমরা পরস্পরকে নিয়ে ঠাট্টা ইয়ার্কিও করি। রীণা অনায়াসে আমার আঙ্গুল নিয়ে খেলা করতে করতে সবার সঙ্গে কথা বলে। পুরুষের মনে যৌন ঈর্ষা ধরাতে রীণার জুড়ি নেই। লোক চলে গেলেই আমাদের সম্পর্ক আবার শীতল হয়ে পড়ে।

পুরনো বন্ধুদের এড়িয়ে চলি। ওরা রীণার কথা জিজ্ঞেস করে। অথচ আমরা আজকাল এক সঙ্গে সামাজিক অনুষ্ঠান ছাড়া কোথাও যাই না।

আমরা এক ছাদের নীচে থাকলেও অনেক অনেক দূর। রীণার সঙ্গে আমার ঝগড়াও হয় না। আশ্চর্য কত তুচ্ছ কারণে তো স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া হয়।

যদিও এ সবই তোমার জানা। তুমি রীণার প্রেমিক। তোমাকে রীণার আরো যোগ্য হয়ে উঠতে হবে। তুমি কি পারবে রীণার সব দাবী মেটাতে। তুমি কি পারবে রীণার সব আব্দার নীরবে হজম করতে। রীণার পোষা স্প্যানিয়েলের মত তোমাকে রীণার সঙ্গী হতে হবে।

তুমি কি জানো রীণা সন্ধ্যেবেলায় তুলোয় করে একটু 'চার্লি' বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। অন্য কোথাও এ গন্ধটা পেলে তোমার কি আমার মত রীণার কথা মনে পড়বে। তুমি কি জানো, রীণা কোন্ ফিল্মী অভিনেতার ছবি অখণ্ড

গীতবিতানের প্রেম পর্য্যায়ের কোন দুই গানের মাঝখানে লুকিয়ে রেখে দিয়েছে। তুমি কি জানো বসন্তের ফুরফুরে বিকেলে রীণা ব্লাউজের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে কি শাড়ি পরে। তুমি জানতে পার না। তোমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তুমি শুধুই প্রেমিক। রীণা বাগচীর প্রেমিক।

অথচ দিন দিন তোমাকে রীণার যোগ্য হয়ে উঠতে হবে। রীণার সমস্ত ছেলেমানুষিকে প্রশ্রয় দিতে হবে। শনিবারের সন্ধ্যায় নিয়ে আসতে হবে সিনেমার দুটো হলুদ টিকিট। কখনও কখনও স্কুটারের পিছনে রীণাকে বসিয়ে নিয়ে যেতে হবে ডায়মণ্ডহারবার। রীণা আলতোভাবে তোমাকে ছুঁয়ে থাকবে। বাতাসে রীণার চুল উড়বে। বাতাসে জয়ের নিশানের মত ওর শাড়ির আঁচল উড়তে থাকবে। মাঝে মাঝে বাতাস থেকে আঁচল সরিয়ে নেবে রীণা। হঠাৎ কোন গ্রাম্য চায়ের দোকানে নেমে বাঁশের উঁচু বেঞ্চে বসে পা দুলিয়ে ভাঁড়ে চা খাবে। কিংবা ফেরার পথে আবছা আলোয় বসে তেলে ভাজা খেয়ে যাবে একের পর এক।

রীণার যোগ্য হয়ে উঠতে গেলে এসব তোমার করা দরকার। আমি সব সময় তোমার পিছনে ছায়ার মত ঘুরছি। আড়ালে থাকলেও তোমাদের গতিবিধি আমার জানা। তুমি কখনো ভোরবেলায় রীণাকে দেখো না। তোমার কাছে আমার মিনতি সকালে ও যখন বেসিনের আয়নার সামনে নাইটির উপর হাউস কোট জড়িয়ে দাঁত মাজে তুমি ওর সামনে এসো না। মনে রেখো তুমি রীণার প্রেমিক। এই বিরাট দায়িত্বের কথা তুমি মনে রেখো সব সময়। আমি রীণার প্রেমিক হয়ে উঠতে পারিনি। আমি শুধুই রীণার স্বামী। আমি জানি তুমি পারবে। রীণার যোগ্য হয়ে উঠতে গেলে আমার ধরতাই গুলি তোমার কাজে লাগবে।

আমাকে তুমি এ্যাতো ভয় পাও কেন? আমি কিছুই করব না। রীণার প্রেমিক হয়ে তুমি যা জান না, আমি তা জানি। রীণার বাইরের খোলসটাকে ভালবেসে তুমি রীণার প্রেমিক। রীণার অনেক কিছু জেনেও আমি কেবলই স্বামী! তুমি দিন দিন যত জানতে থাকবে তত স্বামী হওয়ার দিকে এগুতে থাকবে। পুরোপুরি স্বামী হয়ে গেলে তোমার প্রেমের মৃত্যু হবে। রীণা তখন কেবলমাত্র তোমার যৌন সঙ্গিনী। তখন তোমাকে আমি ছুঁয়েও দেখব না। তোমাকে প্রথম ঘৃণা করব।

সে

তার বয়সটা ঠিক এমন জায়গায় যখন যুবকরা বাসের সীটে বসে থাকলে উঠে দাঁড়িয়ে বসতে দেয়, কণ্ডাক্টর টিকিট কাটার সময় তাচ্ছিল্য ভরে বলে ঃ এই যে দাদু, টিকিটটা। তাজা শরীরের যুবতী চোখে অসভ্যতা দেখলে ভ্রূকুটি করে। অথচ লোকটার বয়স এখন চুয়ান্ন। ষাটও নয়, নয় পঞ্চাশ ; ঠিক বুড়ো বললে তাকে অবমাননা করা হয়।

তার বয়স এখন চুয়ান্ন। বসে থাকে নিজের ঘরে। খাটের পালিশ, সোফার রঙ সব ম্রিয়মাণ হয়ে গেছে। বই-এর থাকে গীতাঞ্জলীর প্রথম সংস্করণের সঙ্গে থাকে রমলা উপন্যাস ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়'। দেয়ালে ব্যায়ামবিদ্ লোকটার সঙ্গে গোবরবাবুর এক সঙ্গে তোলা ছবি। লোকটার বুক থেকে পোকা কাটতে কাটতে গোবরবাবুর জাঙ্গিয়াটা পর্যন্ত খেয়ে ফেলেছে। তবুও লোকটার প্রিয় ফটোগ্রাফটি দেয়ালে ঝোলানো আছে।

এই অতি তুচ্ছ লোকটার জন্য বাইরের কারুর মাথাব্যথা নেই। সে আপন মনে ঘরে বসে থাকে। গুন গুন করে গান গায়। বাইরে থেকে সে গান শোনা যায় না। শোনা যায় না, তার চলাফেরার আওয়াজ। রান্না বান্নার পরিচিত শব্দ ওই বাড়ি থেকে ভেসে আসে না।

লোকটা মাসে মাসে ড্রয়ার থেকে তার মৃত স্ত্রীর রঙীন ছবি বের করে। দার্জিলিং-এ ঘোড়ার পিঠে তার স্ত্রী। তার স্ত্রীর বয়স তখন মাত্র পঁচিশ। ডোমাইড কাগজে তোলা ছবিটা হলদেটে হয়ে গেছে। মুখের স্মিত হাসিটি এখনও লেগে আছে মুখে। একেবারে বুড়ো হয়নি সে। ছবিটা কোনদিন বুড়ো হবে না ভেবে খুশি হয়। অথচ যখন স্ত্রী বেঁচে ছিল দিনরাত তার সঙ্গে ঝগড়া হত। পেতলের ফুলদানী ছুঁড়ে একদিন মেরেছিল তার স্ত্রী। ঠিক চোখের উপর কপালের কাছে এসে লেগেছিল ফুলদানীটা। কপাল কেটে গিয়েছিল লোকটার। ক্ষত সেরে গেলেও কাটা দাগটা রয়ে গেছে। কাটা দাগটায় হাত পড়ে গেলে তার স্ত্রীর কথা মনে পড়ে যায় লোকটার। মনে করতে চেষ্টা করে তার স্ত্রীকে সে সত্যি ভালবাসত কি না। না কি বিনয়ের স্ত্রী গীতার সঙ্গেই তার বেশি ভালবাসাবাসি ছিল। গীতার সঙ্গে তার একটা

অলিখিত সম্পর্ক ছিল, এ ব্যাপারটা বিনয় বুঝতে পারত কি না সে জানে না। গীতা তার মনে জ্বালা ধরাবার জন্য তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে বিনয়ের আঙুল নিয়ে খেলা করত। এ সব স্মৃতির আক্রমণে গল্পের চরিত্রটি নাজেহাল ছিল। অথচ বয়স বেড়ে যাচ্ছিল দ্রুত। এ রকম প্রয়োজনহীন ভাবে বয়স বেড়ে যাবার কোন মানে হয় না।

পুজোর সময় আমেরিকা থেকে তার ছেলে দামী শার্ট পাঠায়। পাঠায় ইলেকট্রিক শেভার। তারপর নিয়মমাফিক বিজয়ার চিঠি দেয়। তাতে প্রণাম জানায় বাবাকে। নতুন একটা গাড়ি কেনার কথা লেখে, তার আমেরিকান স্ত্রী মারিয়ার কথা লেখে। এক মাত্র ছেলে রাহুলের দুষ্টুমির কথা থাকে তাতে।

এই শহরের রাস্তাঘাট ক্রমশই মানুষের অবাসযোগ্য হয়ে উঠেছে দিনের পর দিন। মহাত্মা গান্ধী চৌরি চৌরার ঘটনার পর আন্দোলন তুলে নিয়ে ভুল করেছিলেন—এটা সে আজও বিশ্বাস করে। বারো বছরের গুপ্ত প্রেস পঞ্জিকা সে জমিয়ে রেখেছিল। এখন আর পঞ্জিকা কিনতে হয় না তাকে। কবে একাদশী, কখন পূর্ণিমা এ সব খবর এখন সে সহজেই পেয়ে যায় বারো বছরের পঞ্জিকা থেকে।

এখন তার আপন বলতে প্রায় কিছুই নেই। তার স্ত্রীর স্মৃতিই তার দারুণ আপন হয়ে উঠেছে ইদানীং। এখন ছবিটা সব সময় তার টেবিলের উপর থাকে। তার দিকে তাকিয়ে হাসে। হাসতেই থাকে। ছবিটাকে সে প্রতিদিন ন্যাকড়া দিয়ে মোছে। টেবিল থেকে সমস্ত কিছু সরিয়ে টেবিলটাকে করে তোলে ঝকঝকে, তকতকে। টেবিলের উপর লোকটার যুবতী স্ত্রী সব সময় তার দিকে তাকিয়ে থাকে। ঘরের একেবারে কোণ থেকে, কিংবা দরজার কাছ থেকে বা বাথরুমের দিক থেকে সে ছবির দিকে তাকিয়ে দেখেছে তার যুবতী স্ত্রী তার দিকেই তাকিয়ে আছে সব সময়!

সে তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে সারাদিন। আর আগের মতন ঝগড়া করে না। পুরনো কোন কথা মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দেয় সে। কোন ভুলে যাওয়া ঘটনা হুবহু বলে দেয়। বিয়ের দিন পেছনে দাঁড়িয়ে খই ছড়াবার অনুষ্ঠানে একটু দুষ্টুমি করেছিল সে তার স্ত্রীর সঙ্গে। একটু খানি অসভ্যতাও করেছিল। সে গল্পও করে লোকটা।

ইদানীং একেবারে নিঃসঙ্গ বোধ করে না সে। জীবনটা ভরে রেখেছে ব্যস্ততায়। রাজনৈতিক দলের লোকেরা কড়া নেড়ে চাঁদা চাইতে এলে সমস্ত

দলকে সে দুটাকা করে চাঁদা দেয়। মাঝে মাঝে গানও গেয়ে ওঠে।

পাড়ার লোকেরা অবাক হয়। বহুদিন এ বাড়ি থেকে কোনো গান ভেসে আসে না। কোন আওয়াজ কিংবা কথাবার্তাও শোনা যায় না বহুদিন। এখন তারা খুশি। সব কিছু ঠিক ঠাক আছে। জীবনের ছন্দে কোনো বেতাল হয় নি। তারা জানতে পেরেছে, লোকটা তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে ওঠে সকাল-সকাল। লোকটার ছেলে আমেরিকায় থাকে। আমেরিকান জিনিষ পত্র সহজে পাওয়ার আশায় পাড়ার লোকেরা ভাব জমায় তার সঙ্গে।

পাড়ার লোকেরা জেনে ফেলেছে তার এক ভাই আসামে থাকে। সেখান থেকে টাকা চেয়ে চিঠি পাঠায়। তার এক বোন এ শহরেই থাকে। কিন্তু সে তাকে কোনদিন দেখতে আসে না। পাড়ার লোকেরা আরো জানে, সে তার বউকে ভালবাসত খু-উ-ব।

আজকাল দোতলা থেকে নিচে বল পড়ে গেলে, বাচ্চারা ছুটে এসে বল কুড়িয়ে নিয়ে যায়। দোতলার ঝুল বারান্দায় সম্প্রতি নতুন হোর্ডিং লাগানোর ফলে শোভাযাত্রা কিংবা মিছিল দেখতে বড় অসুবিধা হয়। তাই তারা নিচে চলে আসে।

লোকটা বাড়িতে কেউ এলে তাকে তার স্ত্রীর কথা বলে। স্ত্রীর রূপের কথা বলে। নিষ্কলুষ চরিত্রের কথা বলে। স্ত্রীর সহন শক্তির প্রশংসা করে। তারপর হঠাৎই চা খাবেন কি না জিজ্ঞেস করে বসে। চা খেতে খেতে স্ত্রীর ছবি দেখায় তাদের। স্ত্রীর বসার ভঙ্গি, শাড়ি পরার পুরনো ঢঙ, মাথার চুল ফাঁপিয়ে বাঁধা, চা খেতে খেতে পাড়ার লোকেরা সে সব খুঁটিয়ে দেখে নেয়। ফাঁক বুঝে আমেরিকা থেকে ছেলে কিছু পাঠিয়েছে কি না জিজ্ঞেস করে।

একদিন পাড়ার কে একজন হঠাৎই লক্ষ করে তার স্ত্রীর ছবিটা যেন একটু বুড়ো হয়ে গেছে। একটু বা বিষণ্ণ। বয়সের ভারে যেন একটু ক্লান্ত। প্রতিদিন একটু একটু করে ছবির ওপর তুলি বোলায় লোকটা। তুলিতে সাদা রঙ লাগিয়ে চুলে পাক ধরায়। ঠোঁটের দুপাশে নাকের নিচ থেকে লম্বা কালো রেখা টেনে দেয়। আর একদিন কপালের উপর আড়া আড়ি ভাবে তিনটে বলি রেখা আঁকে। কোনদিন বা বুকের উদ্ধত ভঙ্গি কিছুটা ঢলে পড়ে। শাড়ি-ব্লাউজের জমকালো রঙ একদিন ম্রিয়মান হয়। রঙ বুলিয়ে চোখের যৌবন কেড়ে নেয়া হয়। একটু একটু করে তার স্ত্রীর যৌবনের সবটুকু সে নিঃশেষ করে দেয় একদিন।

তারপর থেকে সে অন্য মানুষ যেন। পাড়ার লোকেরা তার বাড়িতে আসা বন্ধ করে। এ বাড়ির থেকে কোন শব্দ আর শোনা যায় না। এ বাড়ি থেকে চায়ের নিমন্ত্রণ আর কেউ পায় না। ছেলেরা বল কুড়োতে কিংবা শোভাযাত্রা দেখতে একতলা আসে না আর।

তারপর থেকে লোকটার সঙ্গে কারুর যদি দেখা হয়ে যায়, লোকটা জিজ্ঞেস করে, আপনি কি বয়স দ্রুত বাড়িয়ে ফেলতে চান? বলতে পারেন, একটা লোকের বয়স বাড়িয়ে ফেলতে কতদিন লাগে? অথবা কাটা কৈ মাছের মত নিষ্প্রয়োজন প্রাণ শক্তিতে ছটফট করে কি লাভ? কেউ যদি তার বয়স বলত পঞ্চাশ সে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠত। হাতের চারটে আঙুল দেখিয়ে বলত আর চার বছর আছে। তাতে সে কি বোঝাতে চাইত কেউ বুঝতে পারত না। সবাই হাসত। যারা হাসত না তাদের মুখের রেখায় বিষণ্ণতা দেখা যেত। তারপর থেকে সেও দরজা বন্ধ করে রাখত। ঘর থেকে কোন শব্দ ভেসে আসত না আর।

আমাদের গল্পের চরিত্র এইভাবে একদিন মরেই গেল। অত্যন্ত বোকার মত। তার বাড়ির ডাক বাক্সে আসাম থেকে চিঠি আসতে আসতে ভর্তি হয়ে গেল। আমেরিকা থেকে প্রচুর জিনিষ পত্র এসে এসে ফিরে গেল। তার ঘরের টেবিলে তার যুবতী স্ত্রী বুড়ো হয়েই রইল। দেয়ালে রইল গোবরবাবুর সঙ্গে তোলা পোকায় কাটা ফটোগ্রাফ।

এ ভাবে মরে যাওয়াটা অনেকেই পছন্দ করল না। তারা বলতে লাগল লোকটা বড় ভাল ছিল। অথচ দুদিন বাদেই সব ভুলে গিয়ে ট্যুরিষ্ট অফিসে মিরিকে থাকার সুখ সুবিধে কি কি স্ত্রীর সঙ্গে গিয়ে জেনে এল।

এর পর থেকে কেউই আর বলত না সে লোকটার অভাব বোধ করছে। লোকটার বাড়ির নিচ দিয়ে শোভাযাত্রা আর মিছিল আগের মতই যেতে থাকল। দোতলার লোক আবার আগের মতই একতলায় এসে শোভাযাত্রা কিংবা মিছিল দেখতে লাগল।

এ বাড়িতে এখন নতুন দম্পতি এসেছে। তাদের রোজ রাত্রে নাকি ঝগড়া হয়। স্বামীটির বন্ধুর বউ-এর সঙ্গে একটা অবৈধ সম্পর্ক আছে। এই ভাবেই তারা দিন-টিন কাটাতে থাকে। কমতে থাকে খাটের পালিশ আর সোফার রঙ।

বিপিনবিহারীর বেঁচে থাকা

বিপিনবিহারীর নাম কে বিপিনবিহারী রেখেছিল বিপিনবিহারী তা জানে না। এই তিরিশ বছরের ভরা যৌবনে বিপিনবিহারী নামটা তার পদবীর সঙ্গে যুক্ত করতে বিপিনবিহারীর একেবারে ভাল লাগে না। অথচ ছেলেবেলা থেকেই এই অনাধুনিক নাম তাকে বহন করে যেতে হচ্ছে। কেউ কেউ বলে তার ঠাকুমা নাকি বিপিনবিহারী নামটা দিয়েছিল। কেউ বলে নার্সারীতে ভর্তি হবার সময় পাড়াতুতো এক ব্যায়ামবিদ কাকা বিপিনবিহারীকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল। সে কেবল বিপিনবিহারীর ডাকনাম জানত। সেই কাকা তাকে বিপিনবিহারী নাম দেয়। তখনকার দিনে এক বিখ্যাত কুস্তিগীরের নাম ছিল বিপিনবিহারী। অথচ সেই কুস্তিগীরের সঙ্গে বিপিনবিহারীর চেহারার মিল প্রায় নেই বললেই চলে। বিপিনবিহারী সেই কুস্তিগীরের ছবি পুরনো 'ভারতবর্ষে' দেখেছে।

নিতান্তই ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া চেহারা বিপিনবিহারীর। বর্ণনা দেবার কোনো মানে হয় না। আর পাঁচটা বাঙালী যুবকের সঙ্গে বিপিনবিহারীর অমিল সামান্যই। একমাত্র চোখদুটোই তাকে আর সবায়ের থেকে আলাদা করেছে। বিপিনবিহারীর একটা চোখ একটু ট্যারা। বিপিনবিহারী অনেকদিন তার নামের অর্থ খুঁজেছে। খুঁজতে খুঁজতে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার নামের মিল খুঁজে পেয়েছে বিপিনবিহারী। যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয় তখনই পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়। অথচ বিপিনবিহারী অধর্ম, অনাচার দেখেও চোখ ফিরিয়ে থাকে। চোখের সামনে কাউকে খুন হতে দেখলেও চুপি চুপি পালিয়ে আসে নিজের ঘরে। যে ঘরে আছে দুটি চেয়ার, একটা টেবিল, একটা বিছানা, চারটে দেয়াল। দেয়ালের পেরেকে ঝোলানো ছোট্ট আয়না।

একদিন এই বয়সের আর সবায়ের মত বিপিনবিহারী স্বাভাবিক নিয়মে প্রেমে পড়ে। ছল-চাতুরী করে আকর্ষণ করে মেয়েটিকে। মেয়েটিও সাড়া দেয়। মেয়েটিকে দূর থেকে আসতে দেখলে অন্য যুবকের মতই বিপিনবিহারীর

বুক তোলপাড় করে ওঠে। আর গল্প-উপন্যাসে যে রকম ঘটে ঠিক সে রকম ভাবেই সে মেয়েটির সঙ্গে বোটানিকস, রেঁস্তোরা ও সিনেমায় যায়। একদিন সাহস করে সারাদিনের জন্য ডায়মণ্ডহারবারে চলে যায় দুজনে। ছেলেবেলায় আতস বাজীতে পুড়ে যাওয়া গলার কালো কুৎসিত দগদগে দাগটা মেয়েটির কাছে লুকিয়ে রাখে বিপিনবিহারী প্রায় ট্রাপিজ খেলোয়াড়ের কসরতে।

তখন থেকেই সে হন্যে হয়ে চাকরীর চেষ্টা করে। চাকরীর জন্য সে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের উত্তরে রাশি রাশি আবেদনপত্র পাঠায়। অথচ কোথা থেকে কোন উত্তর আসে না। শেষপর্যন্ত বড চাকুরে তার দূর সম্পর্কের এক মামার কাছে যায় বিপিনবিহারী। সেই মামা বেশ কিছুদিন ঘুরিয়ে তাকে একটা কেরানীর চাকরী জুটিয়ে দেয়। চাঁদ হাতে পাওয়ার মত মনে হয়। বিপিনবিহারী সেদিন শিস দিতে দিতে ঘরে ফেরে। রাস্তায় অন্ধ ভিখারীকে পঁচিশ পয়সা দেয়। বাসে বৃদ্ধ লোককে হ্যাণ্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

চাকরী পাওয়ার পর দিনই লেকের ধারে বিপিনবিহারী তার প্রেমিকাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু মেয়েটিকে বিয়ের প্রস্তাব দিতেই মেয়েটি সে প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করে দেয়।

মেয়েটির এ রকম ব্যবহারে বিপিনবিহারী একই সঙ্গে অবাক ও দুঃখিত হয়। তখনই বিপিনবিহারীর মনে হয়, মানুষের জীবনে টাকার বড প্রয়োজন। কেবলমাত্র কেরানী বিপিনবিহারী হয়ে বেঁচে থাকা তার আত্মার কাছে বিপজ্জনক মনে হয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিপিনবিহারী আত্মহত্যার কথা ভাবে। কিছু রেল লাইনে মাথা রাখা, গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বেলে দেয়া কিংবা একসঙ্গে অনেকগুলি ঘুমের বড়ি খেয়ে ফেলার কথা চিন্তা করে বিপিন-বিহারীর ইচ্ছেটা শামুকের মত গুটিয়ে যায়।

তারপর থেকে হঠাৎ বড়লোক হবার আশায় প্রতি সপ্তাহেই লটারীর টিকিট কেনে বিপিনবিহারী। সপ্তাহের শেষে লটারীর ফলাফলের সঙ্গে নিজের টিকিটের নম্বর মেলায়। লটারীর প্রথম পুরস্কার পেলে সে কি ভাবে তার সচ্ছলতা বাড়িয়ে তুলবে, কি ভাবে সাচ্ছল্যের ছটা লাগবে তার শরীরে তা ভাবতে থাকে। গাড়ি কিনলে কাদের গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে ফেলবে তার তালিকা বানায়। তালিকার সবশেষে তার প্রেমিকার নাম লেখে বিপিন-

বিহারী। তারপর কি ভেবে সে নাম কেটে দেয়।

দেয়ালে ঝোলানো আয়নার সামনে দাঁড়ায় বিপিনবিহারী। তার চেহারায় কি কি সমালোচনার যোগ্য খুঁজতে থাকে। খুঁজতে খুঁজতে আয়নায় তার চোখদুটোতে এসে থমকে যায় সে। ঘাড় একটু কাৎ করে, চিবুকটা দৃপ্ত ভঙ্গিতে তোলে, কি ভাবে তার সন্ত্রস্ত চেহারা আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হয়ে উঠবে তার মহড়া দেয়। তারপর তার ট্যারা চোখটা বুজে মনে মনে বলে, 'থ্যাঙ্ক য়্যু বিপিনবিহারী।'

এখন যে কোন লোকের মতই সে সকালে উঠে অফিস যায় আর বিকেলে ফিরে আসে নিজের ঘরে। তার ঘরে আছে দুটি চেয়ার, একটা টেবিল, একটি বিছানা, চারটে দেয়াল আর দেয়ালের পেরেকে ঝোলানো ছোট্ট আয়না। প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় বিপিনবিহারী সিনেমা দেখে নিয়মমাফিক।

অন্য শনিবারের সঙ্গে সে শনিবারের কোনো তফাত ছিল না। সে দিনও সেই চৈত্র সন্ধ্যায় সিনেমাহলের সামনে ফ্লায়িং টিকিটের আশায় দাঁড়িয়ে থাকে বিপিনবিহারী।

সিনেমা হলের সামনে বিরাট ভিড়। সস্তার টিকিটের জন্য মানুষের লম্বা অজগর এঁকে বেঁকে ট্রাম-রাস্তা ছুঁয়ে গেছে। বিরাট ব্যানারে হিংস্র চেহারার এক চীনা পুরুষ লম্বা পা তুলে একজনের চোয়াল ফাটিয়ে দিচ্ছে। পাশের সিনেমা হলের ঢাউস পোস্টারে দুই সোনালী চুলের বিকিনি পরা সুন্দরীর ঘাড়ে হাত রেখে বসে আছে সিন কনোরি। কনোরির স্বাস্থ্যল খালি গা। পুরুষালি দৃঢ় মুখের গড়ন।

কানের কাছে মুখ এনে ব্ল্যাকাররা 'তিন কা সাত', 'তিন কা সাত' বলে চেঁচাচ্ছে। বিপিনবিহারী ভ্যাবলার মত মুখ করে একজন ব্ল্যাকারের কাছে টিকিট চায়।

পাশ থেকে কে যেন চেঁচিয়ে ওঠে, 'ধনা, ট্যারা বংশীকে পেয়ে গেছি এতদিনে।'

চক্রাবক্রা জামা পরা একটা ছেলে এগিয়ে আসে বিপিনবিহারীর দিকে। ছেলেটার হাতে লোহার বালা, গলায় সরু চেন, মুখে ছোট ছোট দাড়ি।

ছেলেটার দৃষ্টি বিপিনবিহারীর চোখের উপর গেঁথে যায়। বিপিনবিহারীর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে যেন। বিপিনবিহারী আমূল কেঁপে ওঠে। কয়েক পা পিছিয়ে যায় বিপিনবিহারী। এ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ পড়লে কি করত

বিপিনবিহারী ভাবে।

ধনা নামের ছেলেটি বিপিনবিহারীকে প্রায় ঠেলতে ঠেলতে ভিড় থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। চারিদিকে ছিমছাম পোশাকের নারী-পুরুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেন স্প্রিং বোর্ডের উপর চলাফেরা করছে এমন সাবলীল।

বিপিনবিহারী প্রায় চেঁচিয়ে বলল, 'আপনারা ভুল করছেন—আমার নাম বংশী নয়।'

—'আবার নকশাবাজি!'

—'বিশ্বাস করুন, কোথাও একটা ভুল হয়ে যাচ্ছে।'

বিপিনবিহারী কাকুতি-মিনতি করতে লাগল।

অথচ ধনা আর তার সঙ্গীরা নিঃসন্দেহ যে যে ট্যারা বংশী। মাস কয়েক আগে কামার পাড়ায় যে অ্যাকশন হয় সে অ্যাকশনে ট্যারা বংশী তাদের দলের বড খোকাকে খুন করেছিল।

একটা ছেলে চেঁচিয়ে ওঠে, 'ধনাদা, ওর ধড থেকে মুণ্ডুটা নামিয়ে দাও।'

সিনেমাহলের সামনে জমায়েত লোকগুলোকে উদ্দেশ্য করে বিপিনবিহারী বলল, 'এই যে শুনুন আপনারা, আমাকে বাঁচান—এরা আমাকে এক্ষুনি নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলবে।'

ধনা নামের ছেলেটি বলল, 'এটা আমাদের প্রাইভেট ব্যাপার, আমাদের হিস্যা আমাদের বুঝে নিতে দিন।'

প্রেমিকা চলে যেতেও বিপিনবিহারী নিঃসঙ্গ হয়নি। বিপিনবিহারীর নিজেকে একই সঙ্গে তুচ্ছ ও অপার শক্তিধর মনে হয়।

ছেলের দল বিপিনবিহারীকে ঘিরে নিয়ে চলেছে। বিপিনবিহারী তাদের কাউকে চেনে না। কখনো দেখেছে বলে মনে করতে পারে না কাউকে। বিপিনবিহারী বুঝতে চেষ্টা করে কখনো বাসে-ট্রামে বা খেলার মাঠে কাউকে কিছু বলেছে কিনা কোনদিন। রাস্তাঘাটে কত সামান্য কারণে ঝগড়া লাগে। বিপিনহিারী এমনই নির্বিরোধী যে সে একটা ঘটনাও মনে করতে পারে না যাতে সে কাউকে আঘাত দিয়ে কথা বলেছে।

বিপিনবিহারী ভয়ে চিৎকার করে ওঠে। কিন্তু ওর গলা দিয়ে কোন শব্দ বেরোয় না। তখন সে নিজের ঘড়ি ছাখে। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করে সেকেণ্ডের কাঁটা স্থির। বিপিনবিহারীকে অবাক করে দিয়ে সময় থমকে থাকে। এই প্রথম সময়ের এগিয়ে যাওয়াকে বিপিনবিহারী ঘৃণা করে।

ট্যারা বংশীকে জানতে বড় লোভ হয় বিপিনবিহারীর। দুজনের চোখ ছাড়া আর কোথায় কোথায় মিল আছে তা যদি এই অন্তিম মুহূর্তে জানতে পারত। ট্যারা বংশীকে কি তারই মত প্রেমিকা প্রত্যাখ্যান করেছে। ট্যারা বংশী কি তারই মত স্মৃতিআক্রান্ত একটি পুরুষ। তারই মত জীবনের একঘেয়েমিতে ক্লান্ত।

চারপাশে উঁচু উঁচু ফ্ল্যাটবাড়ি। জানলায় জানলায় আলো। ঘরোয়া মানুষেরা নিজস্ব কাজে ব্যস্ত। সুখী গৃহিণীরা টুকিটাকি কাজ সারছে ঘরের। স্টিরিয়োতে কেউ বাজাচ্ছে জগঝম্প। কেউ কি রবীন্দ্রনাথের গান গাইছে! কেউ কি তাঁর 'সভ্যতার সঙ্কট' থেকে পাঠ করছে কিছু! কি মধুর মিথ্যায় এরা গা ভাসিয়ে দিয়েছে। এখুনি এই অপরিণামদর্শী যুবকদের হাতে শেষ হয়ে যাবে সে। এই শূন্য চাতালের মাঝখানে বিপিনবিহারীকে শুয়ে থাকতে হবে অবহেলায়। ওর সারা শরীর ফুলে উঠবে নাকের ফুটোয় ঢুকে যাবে পিঁপড়ের সারি। খুব কদর্য ভঙ্গিতে ডিমের খোসা, মাছের কাঁটা আর যত রাজ্যের নোংরার ভেতর পড়ে থাকতে হবে কাল সকাল পর্যন্ত।

ধনা নামের ছেলেটি বিপিনবিহারীর সামনে মেলে ধরে কয়েকটা প্রশ্ন।

—'নাম ?'

—'বিপিনবিহারী।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি একটা চড় কষাল বিপিনবিহারীর গালে। অন্য ছেলেগুলো ঘিরে আছে বিপিনবিহারীকে। অথচ ওদের কেউই একা একা পারবে না বিপিনবিহারীর সঙ্গে। বিপিনবিহারী ভাবে, সরকার যদি প্রতিটি মানুষকে একটা করে রিভলবার দিত।

ছেলেদের মধ্যে একজন বলে উঠল, 'ধনাদা ওকে ছেড়ো না—ঢপ দিচ্ছে।'

ধনা নামের ছেলেটি একটি পড়ে থাকা খালি বীয়ারের বোতল তুলে নেয় হাতে। বোতলের সরু দিকটা ধরে পেছন দিকটা দেয়ালের কোনায় ঠুকে ভেঙে নেয়। বোতলের মোটা দিকটা খোঁচা খোঁচা হয়ে ধারালো হয়ে উঠেছে। ও কি বোতলটা বিপিনবিহারীর পেটে ঢুকিয়ে দেবে।

কখনো সখনো ভেসে আসছে চাপা হর্নের শব্দ, রিক্সার অস্পষ্ট ঘণ্টা। রাস্তায় নেমে পড়েছে সুখী মানুষেরা। এখন কয়েক ঘণ্টা ওরাই কলকাতার ইজারা নিয়ে নেবে। ময়দান ও নদীতীর ভরে যাবে ওদেরই ভিড়ে।

ঠিক তখনই বিপিনবিহারী বংশী নামের খুনী ছেলেটির কথা ভাবে।

বংশীর সঙ্গে তার কোথায় কোথায় মিল তা ভাবতে চেষ্টা করে। গলার কাছে সেই পোড়া দাগটা কি বংশীরও আছে। বিপিনবিহারী ধীরে ধীরে ধনার দলের কাছে নিজেকে সঁপে দেয়। বংশী নামের আড়ালে বিপিনবিহারী বেঁচে থাকতে চায়। শ্রীকৃষ্ণের মতই যুগে যুগে আবির্ভূত হতে চায় যাদের জীবন নির্মমভাবে একরকম তাদের পরিত্রাণের জন্য।

বিপিনবিহারী ভাবে বংশী জন্মেছে তুচ্ছ ক্ষমতা নিয়ে। সে তার নিজের পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকুক, অপব্যয় করুক মানব জন্ম। বিপিনবিহারী এমন কিছু করছে যাতে পৃথিবী তাকে চিরদিন মনে রাখবে। বিপিনবিহারী বুঝতে পারে না মানুষ কিসে ভয় পায় আর কাকে জয় বলে মনে করে। বিপিনবিহারী এমন একটা বিন্দুতে পৌঁছেছে যেখান থেকে ফিরে আসা বিপিনবিহারীর পক্ষে সম্ভব নয়।

বিপিনবিহারীর বুকের ভেতরটা ফাঁকা হয়ে উঠেছে। একবার আকাশের দিকে আর একবার চারপাশের বাড়িগুলোর দিকে তাকায় বিপিনবিহারী। ধনার দল বিপিনবিহারীকে ধীরে ধীরে ঘিরে ফেলছে। আর মাত্র কয়েক হাত দূরে ধনা। ধনার হাতে ভাঙা বোতল। মৃত্যুর আগের মুহূর্তটা অনুভব করছে বিপিনবিহারী। সেই অন্তিম সময়েও বিপিনবিহারী আর একটা তালিকা বানালো গাডি কিনলে যাদের গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে ফেলবে। সেই তালিকার শীর্ষে উঠল ধনার নাম।

দূর থেকে ভেসে আসছে হিন্দী গানের সুর—রাম্বা হো হো। কারা যেন উল্লাসে ফেটে পড়ছে। বিপিনবিহারীর আর হারাবার মত কিছু নেই। আকাশে তারারা যেন অনেক কাছে এসে গিয়ে সামিয়ানার মত দুলছে। পায়ের নিচে মাটি দুলছে বিপিনবিহারীর।

বিপিনবিহারী বাঁচার জন্য আর চেষ্টা করে না। সে ভাবে, কম করে আরো চল্লিশটি বছর তাকে এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হবে নিষ্প্রয়োজনভাবে কেবলই বিপিনবিহারী হয়ে। অপচয়যোগ্য আগামী বছরগুলির কথা ভেবে বিপিনবিহারী নিজেকে এক বাতিল মানুষ বলে ভাবে। বংশী নামের আড়ালে যে খুনী মানুষটি লুকিয়ে আছে মৃত্যুর এত কাছে এসেও বিপিনবিহারী তার উপর রাগ করতে পারে না বরং 'তিন উল্লাস' জানায়।

বিপিনবিহারী একবার ভাবলো সর্বশক্তি দিয়ে ধনা নামের ছেলেটিকে একটি ঘুষি চালায়। ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ুক চাতালের উপর। অথচ কিছুই

পারে না বিপিনবিহারী। জীবনে এই প্রথম একটি প্রয়োজনীয় মানুষ বলে বিপিনবিহারী বিবেচিত হচ্ছে। ধন্য হচ্ছে মানব জন্ম। সে মনে মনে পুলকিত হয়। বংশী নামের খুনী মানুষটিকে দেখতে বড় সাধ যায় বিপিনবিহারীর। গত তিরিশ বছরের ব্যর্থ ভালোত্বর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরে বিপিনবিহারী খুশি হয়।

শেষবারের মত তিরিশ বছরের অপচয়িত বছরগুলোর কথা ভাবতে থাকে বিপিনবিহারী। একবারের জন্য তার প্রেমিকার মুখ ভেসে ওঠে। চকিতে তার প্রায় গরুর মত ঠাণ্ডা চোখ আর পিচ্ছিল ঠোঁটদুটোর কথা ভাবে বিপিনবিহারী। শৈশবে ছবিতে দেখা কুস্তিগীর বিপিনবিহারীর মাস্‌লময় চেহারাটা ক্ষণিকের জন্য মনে পড়ে তার। ধনার দলের ছেলেদের মুখগুলো ঝাপসা হয়ে ওঠে। বিপিনবিহারীর চোখের সামনে একটা জোনাকি কেবল জলছে আর নিবছে। ধনা তীব্র চিৎকারে কি একটা বলে ওঠে। বিপিনবিহারীর কানে কিছু ঢুকছে না। পেটের মধ্যে তীক্ষ্ণ কি একটা ঢুকে যাচ্ছে যেন। সঙ্গে অশ্লীল কয়েকটা শব্দ।

বিপিনবিহারী উবু হয়ে বসে পড়েছে মাটিতে। কিছুতেই উঠতে পারছে না। বিপিনবিহারী বারকয়েক চেষ্টা করে উঠে দাঁড়াবার। উঠে দাঁড়াতেই যেন তার কেটে যাচ্ছে কয়েকটা বছর। টাটকা রক্তের তীব্র গন্ধে বিপিন-বিহারীর ইন্দ্রিয় ভরে যায়।

জোনাকিটা আর জলছে না। কোথাও একটুকরো হাওয়া নেই।

মানচিত্র

সেটা ছিল ছুটির দিন। সবে সন্ধ্যে হয়েছে। রাস্তায় সারবদ্ধ ভিক্টোরিয়ান স্তম্ভে নীল ফ্লোরেসেণ্ট আলোর ঝলমলে টিউব। ঘরের মধ্যে সমুজ্জ্বল আলোর ভূম। তার ভেতর নির্বান্ধব বসে আছে ওরা দুজন। ওদের সবাই স্বামী-স্ত্রী বলে জানে। কিন্তু ওরা পরস্পরের প্রতি কোন আকর্ষণ অনুভব করে না ইদানীং। মেয়েটির কাছে পুরুষটির ঠোঁট দুটো প্রবল কামেচ্ছা জাগাবার মত যথেষ্ট পুরু ও কালো নয়। পুরুষটির কাছে মেয়েটির আর কোনো রহস্য নেই যেন। মেয়েটির চেয়ে অনেক অসুন্দর নারীর কল্পনায় সত্যই সে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

সেই বিছানার শূন্যতা, রান্না ঘরের গলিতে স্যাঁত সেঁতে অন্ধকার, বাথরুমের আধখোলা অশ্লীল দরজা, সপ্তাহ শেষে নিয়ম মাফিক সিনেমার দুটো হলদে টিকিট —এর মধ্যে আষ্টে পিষ্ঠে জড়িয়ে আছে ওরা দুজন।

নিজেদের মধ্যে নানা কথাবার্তা চালাচ্ছিলো ওরা, অঙ্গ ভঙ্গি ও হাসি করছিল চালাচালি। এ ছাড়া সমস্ত বাড়ি অন্ধকার ও স্তব্ধ।

মেয়েটি পাড়ার লাইব্রেরীর মেম্বার। প্রতিদিন একটা করে বই চাই তার। ছেলেটি যখন অফিসে থাকে মেয়েটি সারা দিন বই পড়ে। বিছানার ঘনিষ্ঠ বর্ণনাগুলিতে সে উত্তেজনা বোধ করে। তাই বার বার পড়ে।

ওরা মাঝে মাঝে পুরনো কথা বলে। বিয়ের সময়কার কথা বলে।

মেয়েটি বলে, বিয়েতে রুনি মাসি এসেছিল।

ছেলেটি বলে, বিয়ের পর আমরা মুসৌরী গিয়েছিলাম।

মেয়েটি বলে, তুমি কিন্তু ভীষণ অসভ্য ছিলে।

ছেলেটি বলে, তুমি যা করেছিলে!

লজ্জা পায় মেয়েটি। তারপর হাসে। ছেলেটি দুষ্টুমি করে তাকায়। তারপর হাসে। তারপর দুজনে এক সঙ্গে হাসতে থাকে। হাসতেই থাকে।

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের আলো নিভে যায়।

গত এক বছরে ওদের বাড়িতে কেউ বেড়াতে আসেনি। ছেলেটি অফিসে গেলে মেয়েটি সারা দিন একা একা থাকে। ওর কিছুই করার থাকে না।

রেডিয়োতে গান শোনে। বই পড়ে। বালিশে রঙীন সুতো দিয়ে ফুল তোলে। মাঝে মাঝে ভুতুড়ে টেলিফোন আসে। কথা বলে। কেউ কেউ তার রূপের প্রশংসা করে। কেউ করে শরীরের। কেউবা কু-প্রস্তাব করে। তখন সে টেলিফোন রেখে দেয়।

সারা বাড়িতে মেয়েটি ঘুরে বেড়ায় একাকী। ওদের বিছানার চাদর সারা দিন টান টান থাকে। মেয়েটির শাড়ির আঁচল ময়লা হয় না। ঘরের কোণে কোনো ভাঙ্গা খেলনা, কিংবা চোখ খোঁটা পুতুল নেই, নেই কোনো পাতা ছেঁড়া ছবির বই। তাই তাকে কেউ স্ত্রী আচারে ডাকে না। উলুধ্বনি দেবার জন্য ওর খোঁজ পড়ে না কোনদিন।

মেয়েটি বলে, জানো, মাঝে মাঝেই আমার মুসৌরীর কথা মনে হয়।

ছেলেটা বলে, মুসৌরীর পথে হেয়ার পিন বাঁক।

মেয়েটি বলে, দারুণ থ্রিলিং।

ছেলেটা বলে, মুসৌরীর রাস্তাগুলোর কথা তোমার মনে আছে?

মেয়েটি বলে, মুসৌরীর মানচিত্র আমার চোখের সামনে জ্বল জ্বল করছে।

ছেলেটি বলে, আমরা আইস স্কেটিং করেছিলাম।

মেয়েটি বলে, রঙীন সোয়েটারে তোমাকে দারুণ ম্যানলি দেখাচ্ছিল।

ঠিক সেই সময় দরজায় কড়া বেজে ওঠে। ওরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। কিন্তু ওঠে না। অপেক্ষা করে। কিছুক্ষণ কোন শব্দ নেই। ছেলেটির নাম ধরে পুরুষ কণ্ঠে কে যেন ডাকে। ওরা চুপ। শব্দ নেই। আবার শব্দ হয় একবার—দুবার—তিনবার।

দরজার ছিটকিনি খোলার জন্য এগোয় ছেলেটি। সেই মুহূর্তে ঘরের আলো নিভে যায়।

মেয়েটি কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করে বলে, দাঁড়াও, আলো নিয়ে যাও। মোমবাতি জ্বালিয়ে তার হাতে দেয় মেয়েটি। মোমবাতির স্নিগ্ধ আলোর শিখা হাওয়ায় নাচতে থাকে। গালের উপর মেয়েটির গরম নিঃশ্বাস টের পায় ছেলেটি। টের পায় নিঃশ্বাসের নিয়মিত তরঙ্গ।

ছেলেটি আলো হাতে ছিটকিনি খোলে। দূরে ফটকের ওপারে একজন স্বাস্থ্যল ছায়ামূর্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে। তার কাঁধে ভারি ব্যাগ। সে দ্রুত পায়ে ছোট্ট নয়নজুলি পেরোয়, তারপর ফটক খুলে বলে, আরে তুই!

ওরা দুজন ধীরে ধীরে বাড়ির ভেতর ঢোকে। লাল জ্যাকেট পরা, ব্যাগ কাঁধে ছেলেটিকে দেখে মেয়েটি চমকে ওঠে। এই সেই পুরুষ যা সে পুরুষদের মধ্যে এত দিন চেয়েছে।

ছেলেটি ঘরের মধ্যে এসে বসে। ব্যাগের ভেতর নানা টুকিটাকির ভেতর হাটকায়। এক সময় খুঁজতে খুঁজতে একটা গোটানো কাগজ বের করে। ওটা একটা মানচিত্র।

ছেলেটি তার বেড়ানোর গল্প করে। সেখানকার পাহাড়, পর্বত,নদী, সমুদ্র, মানুষজনের গল্প করে। অচেনা পাখি, অজানা জানোয়ারের কথা বলে। অতি নাটকীয় ভঙ্গিতে সে হাত নাড়ে। মাঝে মাঝে চিৎকার করে ওঠে।

ছেলেটি বন্ধু পত্নীর প্রতিটি মুখের রেখা, আনন্দ-বিষাদ, সুখহীনতা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। মেয়েটি মাথা নিচু রেখেও এটা টের পায়।

তারপর ছেলেটি গোটানো মানচিত্রটি খুলতে থাকে। টেবিলের উপর মানচিত্রটা বিছিয়ে দেয় সে। মানচিত্রটির চার কোণে চারটি পেপার ওয়েট চাপা দেয়। মোমবাতির আলোয় মানচিত্রের সমস্ত কিছু উদ্ভাসিত হয়ে পড়ে। নদী, হ্রদ, সমুদ্র, পাহাড়, বন, মরুভূমি, রেল লাইন, মোটর পথ চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ছেলেটি একটা পেন্সিলের সরু মুখ দিয়ে এক একটা জিনিষ চেনাতে থাকে। ব্যাগের ভেতর থেকে ছোট্ট ট্রানজিষ্টার বের করে চালিয়ে দেয় সে। মৃদুস্বরে নেপথ্য সঙ্গীতের মত বাজনা বাজে।

লাল জ্যাকেট গায়ে ছেলেটি নানা নূতন জায়গার বর্ণনা দিতে থাকে। কোথায় রেল লাইন নেই, কোথায় পাঁচ মাইল হাঁটা পথে যেতে হয়, কোথায় খাবার মেলে না, কোথায় সিগারেট কেনার জন্য দশ মাইল লাফা যাত্রায় বেরুতে হয়।

ওদের তিনজনের বড় বড় ছায়া ভূতের মত দেয়ালে দোলে। বাজনার উপর দিয়ে লাল জ্যাকেট পরা ছেলেটির গলা শোনা যায়। গলার স্বর মাঝে মাঝে উঁচু গ্রামে ওঠে, মাঝে মাঝে খাদে নেমে যায়। তখন শোনাই যায় না গলা। শুধু ট্রানজিষ্টারে তার সানাই বাজে। খোলা মানচিত্রের সামনে ওরা তিনজনে বসে থাকে।

এক সময় মেয়েটি উঠে যায়। পাশের ঘরে পেয়ালা-পিরিচের টুং টাং শব্দ

হয়। চামচ নাড়ার শব্দ। দু কাপ চা নিয়ে এসে টেবিলের উপর মানচিত্রের সামনে রাখে। চায়ের কাপে ধোঁয়া ওঠে।

চা খেতে খেতে দুই বন্ধুর অনেক পুরনো কথা হয়। অনেক ভুলে যাওয়া ঘটনা মনে করে। অনেক মজার মজার কথা বলে ওরা হাসে। তার মধ্যে প্রেমের কথা থাকে, থাকে বীর্যের কথা। মাঝে মাঝে তার মধ্যে আসে নারী। আসে আদি রস। তখন মেয়েটি লজ্জা পেয়ে মুখ নিচু করে। ওর চোখের ভেতর হাসি নাচতে থাকে।

মেয়েটি বলে, আমরা একবার মুসৌরী গিয়েছিলাম।

ছেলেটা বলে, মুসৌরীটা কেমন সাজানো মনে হয়।

মেয়েটা বলে, রোপওয়েতে দারুণ মজা।

ছেলেটা বলে, অদ্ভুত কনকনে ঠাণ্ডা।

মেয়েটা বলে, একটা তারের উপর দিয়ে যখন রোপওয়ের চাকাটা ঘর্ ঘর্ শব্দে এগিয়ে যায়—ফ্যাসিনেটিং লাগে। অনেক নিচ দিয়ে রাস্তায় লোকজনের চলা ফেরা দেখা যায়। হঠাৎ যখন প্ল্যাটু-টায় পৌঁছয়—সামনে তুষার-ধবল গিরিশৃঙ্গ।

ছেলেটা বলে, আনন্দে সাধু ভাষা বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে।

মেয়েটা হেসে ওঠে। ছেলেটা হাসে। লাল জ্যাকেট পরা লোকটাও। হাসতে হাসতে লাল জ্যাকেট পরা লোকটা সিগারেটের ধোঁয়ায় বিষম খায়।

মেয়েটাকে বিষণ্ন দেখায়। লাল জ্যাকেট পরা ছেলেটার জন্য ওর দুঃখ হয়।

ও বলে, আপনি বড্ড সিগারেট খান কিন্তু।

লাল জ্যাকেট পরা লোকটা হাসে। তারপর পেন্সিলের সরু মুখ দিয়ে মানচিত্রের নানা জায়গা দেখাতে থাকে। অদ্ভুত সুন্দর সুন্দর সব নাম। জঙ্গলের বর্ণনা দেবার সময় তার মুখ জ্বল জ্বল করে। তাকে তখন অরণ্যের মানুষ বলে মনে হয়। তার চোখ দুটো লাল হয়ে ওঠে। কপালের উপর বিজ বিজে ঘাম দেখা যায়। ট্রান্জিষ্টারের বাজনার উপর দিয়ে তার গলা শোনা যায়। নিঃসঙ্গ, নির্বান্ধব দম্পতি ওর কথা শুনতে থাকে। ওদের চোখের সামনে জঙ্গলের ছবি ভেসে ওঠে। চারিদিকে ভেজা গাছগাছালির গন্ধ। পাখির কিচির মিচির কানের কাছে ফেটে পড়ে। নানা রকম জন্তুর আওয়াজে মেয়েটি ভয় পায়।

ঠিক সেই সময় মোমবাতির আলো দপ করে নিভে যায়। অন্ধকার ওদের তিনজনকে গিলে ফেলে। অন্ধকার জঙ্গলে হিংস্র প্রাণীর মত ওরা তিনজন পরস্পরকে চিনে নিতে চায়। ট্রাঞ্জিষ্টারে বন্য একটা সুর বাজতে থাকে। ওরা কথা হারিয়ে ফেলে। চারিদিকে আদিমতা নেমে আসে।

ওদের তিনজনের সামনে মানচিত্রটা অজানা এক জন্তুর মত অন্ধকারে পড়ে থাকে।

সামান্য মানুষের মৃত্যু

লোকটার নাম ছিল হরিপদ। বয়স চল্লিশ ছুঁই ছুঁই। গায়ের রঙ শ্যামবর্ণ, মাথায় কোঁকড়া চুল। লোকটা একটা সরকারী অফিসে কেরানির চাকরী করত। প্রতিদিন সকাল দশটার ভেতর তাকে অফিসে হাজিরা দিতে হত। দশ মিনিট দেরী হলে লাল কালিতে সই করতে হত তাকে। তাই কোনদিন তার অফিস যেতে দেরী হয়ে গেলে সে একই সঙ্গে বাসের কণ্ডাক্টর ও যে বেয়ারা হাজিরা খাতা বড় বাবুর কাছে নিয়ে যেত তাদের উপর রেগে যেত। সারাদিন খুব খারাপ যেত তার। নিজের টেবিলে বসে সে একটা খাতায় ১০০ বার দূর্গা নাম লিখে তবে কাজে হাত দিত। প্রতিদিন টিফিনের সময় সে কাটা ফল খেত হিন্দুস্থানী ফলঅলার কাছ থেকে। ফলের মধ্যে থাকত পেপে কলা, তরমুজ ও অন্যান্য মরশুমী ফল। কারণ সে জানত বাঙালীদের খাদ্য তালিকায় ফল প্রায় থাকেই না, যেটা স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বিশেষ প্রয়োজন।

হরিপদ নামটা পদবীর সঙ্গে বহন করতে গল্পের হরিপদর একেবারে ভাল লাগত না। তার এ নামটা কে রেখেছে সে জানত না। জানলে নিশ্চয় তাকে খুন করত এ রকম একটা ইচ্ছে সে মনে মনে পোষণ করত।

সে অনেক কিছু জানত। সব সময় পৃথিবীর কোথায় কি ঘটছে তা ওর নখদর্পণে থাকত। কিছুদিন বাদেই সব জানা হয়ে গেলে সে ম্রিয়মান হয়ে পড়ত।

মাঝে মাঝে হরিপদ ভাবত তার নিজের নামটাকে সে বদলে ফেলবে। আদালতে গিয়ে চটকদারী এক নাম এফিডেফিট করে নিয়ে নেবে ও। এই উত্তেজনাহীন বিরক্তিকর জীবনটাকে পাল্টে ফেলবে আমূল। কিংবা এমন কিছু করবে যাতে সে রাতারাতি বদলে যেতে পারে।

ঠিক সেই সময় সে আচমকাই একটা মেয়ের প্রেমে পড়ে। মেয়েটির নাম রিংকি। তাজা মোরগফুলের মত রিংকির পিছু নেয় হরিপদ। উপন্যাসের নিয়মেই তার সঙ্গে আলাপ হয় রিংকির। প্রথমে এক সঙ্গে রেস্টুরেণ্টের পর্দা দেয়া কেবিনে বসে স্পেশাল ডিশ খায়। তারপর আর পাঁচটা প্রেমিকের মতই

বলে, মৌরী খাবে ? একদিন সিনেমা হলের অন্ধকারে পাশাপাশি বসে হাতে হাত রাখে। তারপর চুমু খায়।

নিজের নামটা স্বভাবতই পাল্টে ফেলে হরিপদ। নতুন একটা আধুনিক নাম নেয়! সে নাম শুনে রিংকি পুলকিত হয়। উপন্যাসে পড়া প্রেমের সংলাপ দুজনে বলতে থাকে। যার পরে যে কথাটি বলা দরকার দুজনে সেই কথাটি ঠিক ঠিক মিলিয়ে বলতে লাগল। তারপর দিনের পর দিন ঘনিষ্ঠতর হতে থাকল। ঘনিষ্ঠতাব সুযোগে রিংকি গর্ভবতী হয়ে পড়ে নিয়ম মাফিক। ভয় পেয়ে রিংকি হরিপদকে বিয়ে করতে বলে। হরিপদ উপন্যাসের লম্পট নায়কের মত বলে : ডোণ্ট গেট সো নার্ভাস। অ্যাবরশন ইজ নট এ প্রবলেম নাউ। রিংকি কাঁদতে থাকে। শাপ-শাপান্ত করতে থাকে হরিপদকে।

কিন্তু হরিপদ এ সব কথায় কান দেয় না। সব কিছুই ঠিক-ঠাক ঘটে যাচ্ছে জীবনের মতই দেখে সে দুঃখ পায়।

তাই সে রিংকিকে এড়িয়ে চলে। কিছুই বদলাতে পারে না ভেবে মনে মনে সে ভীষণ চটে যায়। বরং নিজেকে বদলাতে না পেরে সে প্রতিদিন নতুন কিছু শিখতে থাকে। নিয়ম মাফিক চলবার জন্য সে প্রাণ-পণ চেষ্টা করতে থাকে। তাই সে রাস্তা পেরুবার সময় জেব্রা ক্রশিং দিয়েই চলতে থাকল। রাস্তায় চলাব সময় বাঁ দিক ঘেঁষে যেতে লাগল। রীতি-নীতি ও চিন্তার প্রথা-মাফিক নিয়মগুলো শিখে ফেলল দ্রুত। মেয়েদের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করা উচিত তেমন, গুরুজনদের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করা দরকার তেমন, বাচ্চাদের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করা প্রয়োজন তেমনই করতে থাকল অবিরত। ধীরে ধীরে আর পাঁচটা মানুষের মত সমাজের সঙ্গে যাতে খাপ-খাওয়াতে পারে তার জন্য চেষ্টা করতে লাগল।

কিন্তু সেটাও বড্ড একঘেয়ে ভেবে সে নতুন কিছু করে সবাইকে চমকে দিতে চাইল। সে এমন কিছু বলবে যা মানুষ এর আগে কখনো শোনে নি। সে এমন কাণ্ড ঘটাবে যা এর আগে কখনো ঘটেনি। সে এমন কিছু আবিষ্কার করবে যা পৃথিবী জানে না। সেই যুগান্তকারী আবিষ্কারে বিজ্ঞান এক লাফে অনেকদূর এগিয়ে যাবে। হরিপদর নাম 'গিনেস বুক অব রেকর্ডে' লিপিবদ্ধ থাকবে।

তাই সে শহর ছেড়ে অনেকদূরে গিয়ে রইল। কাগজ কিনে তাতে নানা রকম আঁকিবুঁকি কাটতে লাগল। সংখ্যার পর সংখ্যা লিখে খাতা ভরিয়ে

ফেলল হরিপদ। কিন্তু দিনের পর দিন মাথা ঘামিয়েও এমন কিছু বের করতে পারল না যাতে নিজেকে পুরোপুরি বদলে ফেলা যায়।

তখন সে ঠাকুর্দার বাবার আমলের রূপোর গড়গড়টা বের করে দেরাজ থেকে। বড় মমতায় তার গায়ে লেগে থাকা ধুলো ঝাড়ে। কলকেতে কালো কালো টিকে আর গয়ার তামাক সাজিয়ে আগুন জ্বালে। তারপর নলটা মুখে চেপে ধরে ভক্‌ভক্ করে ধোঁয়া টানে। এতে সে দারুণ তৃপ্তি পায়। যদিও সে জানে গড়গড়ার নিচের অংশটা তার বাবা পাল্টেছেন, আর নলটা পাল্টেছেন তার ঠাকুর্দা।

এটাও তার বেশিদিন ভাল লাগে না। তখন সে প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলায় প্রতিবেশীর বাড়ি গিয়ে তাশ খেলে। তাশ খেলতে খেলতে চিৎকার করে। বিরোধী খেলুড়ের সঙ্গে নিয়ম কানুন নিয়ে তর্ক জুড়ে দেয়, ভুল খেলার জন্য সঙ্গীকে দোষারোপ করে আর খতিয়ে দেখে চিড়িতনের টেক্কাটা না খেলে হরতনের বিবিটা খেললে খেলাটা কোনদিকে মোড় নিত। এরপর আরো কিছুদিন নিয়ম মেনে চলে সে তাশ খেলে। তারপর হঠাৎই একদিন ওয়ান ক্লাব-এর বদলে ফোর নো ট্রাম ডেকে খেলাকে তছনছ করে দেয়। অন্য খেলুড়েরা অবাক চোখে তাকে দেখে। সেদিন থেকে তাকে আর খেলায় নেয় না কেউ।

তারপর থেকে সে কখনো আর রাস্তার বাঁ দিক ধরে হাঁটেনি। জেব্রা ক্রশিং-এর বাইরে দিয়ে হেঁটে রাস্তা পার হয়েছে। যেখানে 'প্রস্রাব করিও না' লেখা সেখানে পেচ্ছাপ করেছে। বিপদের সময় অন্য কারুর কথা না ভেবে কেবল মাত্র নিজের কথা ভেবেছে। মেয়েদের আর বাচ্চাদের বাঁচাতে চেষ্টা করেনি। থুতু ফেলার টিনে থুতু না ফেলে ঝক্‌ঝকে মেঝের উপর গয়ের ফেলে সে সবার থেকে আলাদা হবার চেষ্টা করেছে। কালমূর্তির সামনে সব সময় অবনত থাকতে হয় জেনেও হরিপদর চোখ অন্য কোথাও আটকে গেছে। এমন কি সঙ্গমরত অবস্থায় সে বাঁ হাতে পানের খিলি মুখে দিয়েছে অনায়াসেই।

নিজেকে বদলাবার হাজার চেষ্টা করেও এক চুলও বদলাতে পারেনি সে। ততদিনে তার প্রাকৃতিক নিয়মে চুল পেকেছে, গাল তুবড়ে গেছে, দাঁত হয়েছে নড়বড়ে।

কিছুই করতে না পেরে হরিপদ একদিন ঘোষণা করে দেয় যে, সে টাটা সেণ্টারের উপর থেকে লাফিয়ে রাস্তায় পড়বে। অমুকদিন ঠিক সকাল আটটায়।

একমাত্র হরিপদই জানে সেদিন তার জন্ম দিন। চল্লিশ বছর আগে এমন এক চৈত্রসকালে এ পৃথিবীর মুখ দেখেছিল হরিপদ। তাই টাটা সেণ্টারের উপর থেকে মাটিতে লাফিয়ে পড়তে এ দিনটিকেই বেছে নিয়েছিল সে। রাজনীতির লোকেরা এ ব্যাপারটাকে ভাল চোখে দেখল না। এই নায়কপণাকে তারা বুর্জোয়া সমাজের ফাঁপা অন্তঃসারশূন্যতা বলে আখ্যাত করল। সাংবাদিকরা এ খবরটাকে কিছুই মূল্য না দিয়ে পাঁচের পাতার এক কোণে ছোট করে ছেপে দিল। সরকার পক্ষ খবরটাকে গুরুত্ব না দিয়ে বিধান সভায় পরিবেশ-দূষণ বিষয়ে আলোচনায় সময় কাটালো। পুলিশ আগের দিন উরুগুয়ের বিদেশ মন্ত্রীর প্রটোকল সামলাতে গিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে পরদিন সকালে টাটা সেণ্টারে উপস্থিত হতে পারল না। গণতান্ত্রিক দেশে পুলিশের ভূমিকা বিষয়ে জমায়েত মানুষেরা বলাবলি করল। তারপর কথা শেষ হতে অধীর আগ্রহে মাথা উঁচু করে টাটা সেণ্টারের আঠারো তলা বাড়ির ছাদের দিকে তাকিয়ে রইল অপলক। শেষ পর্যন্ত হরিপদ যে মারাত্মক ইচ্ছেটা পরিত্যাগ করবেই এ ব্যাপারে সবাই প্রায় নিঃসন্দেহ ছিল। কিন্তু আটটা বাজবার দুমিনিট আগে টাটা সেণ্টারের ছাদের উপর যখন হরিপদর নিতান্তই শীর্ণ চেহারাটা চোখে পড়ল মানুষগুলো চিৎকার করে উঠল। কিন্তু তখনও মনের কোণে সন্দেহ ছিল ঘটনাটা যেমন ঘটে তেমনই ঘটবে। অথচ হরিপদ সমস্ত নিয়ম ভেঙ্গে দিয়ে শূন্যে ঝাঁপ দিল। কালো পিচের রাস্তায় চার হাত পা ছড়িয়ে হরিপদ শুয়ে রইল যতক্ষণ না পুলিশ আসে। এত সহজে ব্যাপারটা ঘটে গেল দেখে সবাই খুব খুশি হল না। বরং হরিপদ তার উল্টোটা স্বাভাবিক ভাবে করবেই ভেবে দিলখুশ ছিল। অথচ হরিপদের মত একজন সামান্য মানুষ নিতান্তই সাধারণের মত মারা গেল।

সঙ্গীতপ্রেমিক

যে কোন লোকের সঙ্গীতপ্রেমিক হয়ে ওঠা খুব কষ্টকর কিছু নয়। তবে তার বয়স হতে হবে চল্লিশের কাছাকাছি। বছর দুয়েক কম কিংবা বেশি। মাথার পিছন দিকে একটা ছোটখাট চাঁদের মত চক্‌চকে টাক থাকা দরকার। ঝুলপি দুটো রূপোলী হলে বেশি মানায়। তবে হতেই হবে তার কোনো মানে নেই। যে কোনো সঙ্গীতানুষ্ঠানে তিনি পিছনের দিকে একটি চেয়ার নিয়ে চুপচাপ বসে থাকবেন। কণ্ঠ কিংবা যন্ত্র যে কোনো সঙ্গীতই হোক তিনি শুনবেন শান্তভাবে। তার জেনে রাখা দরকার সম্রাট আওরঙজেব সঙ্গীতকে ইস্‌লামবিরুদ্ধ বলে মনে করতেন। আর আকবর ছিলেন সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক। তার আরো জানা দরকার দীর্ঘমাত্রার গানেই পাখোয়াজ সঙ্গত হয়ে থাকে। দাদ্‌রার মতন লঘুতাল মৃদঙ্গে ভাল লাগে না। বিবাহিত হলে সঙ্গীতপ্রেমিক হওয়া মুশকিল। রাতের পর রাত বাড়ি না ফেরা কোন্ বিশ্বস্ত স্ত্রী-ই বা মেনে নেয়।

এই রকম এক সঙ্গীতপ্রেমিকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল এক গানের আসরে। কাঁটায় কাঁটায় সাতটার সময় সে এসে হাজির হয়। একই জায়গায় সারারাত বসে থাকে সে। কেউ লক্ষ্য করে না কখন সে আসে, কখন চলে যায় নিঃশব্দে। মাঝে মাঝে সঙ্গের থার্মোফ্লাস্ক থেকে কাপে কফি ঢালে। গান শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে কফিতে চুমুক দেয়।

যে কটি দিন সে গানের আসরে থাকে আমার সাহচর্য কাটে তারই সঙ্গে। সে কথা বলে কম। মাঝে মাঝে দুই-একটা প্রশংসাসূচক মন্তব্য তার মুখ থেকে ফস্কে বেরিয়ে পড়ে। কখনো বা অভিজাত ভঙ্গিতে করতালি দেয় সে। তার মাথার পিছনের ছোট্ট টাক, রূপোলী ঝুলপি, শান্ত গোবেচারা চেহারা, অস্ফুট কয়েকটি প্রশংসা বাক্য তাকে আমার কাছে প্রকৃত সঙ্গীতপ্রেমিক করে তোলে। তাকে দেখে হলভর্তি শ্রোতাকে আমার সঙ্গীত বিষয়ে নিতান্তই অজ্ঞ বলে মনে হয়।

সে অত্যন্ত সরল ও কোমলস্বভাবী। সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করবার সময় সে প্রতিবারই বাচ্চা ছেলের মত সিঁড়ির ধাপগুলো গুনে ফেলে। জুতোর শব্দ

তোলে এমন ভঙ্গিতে যেন মৃদুলয়ে বাজনা বাজছে কোথাও। ঘুরন্ত বৈদ্যুতিক পাখার শব্দ শুনে সে আবিষ্কারের আনন্দে লাফিয়ে ওঠে।

মৌমাছির একটানা গুঞ্জন ধ্বনির মত সে ধ্বনি শুনে সঙ্গীত প্রেমিক শিশুর কৌতূহল নিয়ে আমার দিকে তাকায়। যাবতীয় শব্দের মধ্যেই সঙ্গীতের অপার রহস্য লুকিয়ে আছে, এ বোধ তাকে ধীরে ধীরে আর সবার থেকে আলাদা করে দিয়ে সত্যিকারের একজন সঙ্গীতপ্রেমিকে পরিণত করে।

সেই রাতের পর থেকে আমাদের দুজনের মধ্যে ঘন ঘন দেখা হতে থাকে। সে আমার ও আমার স্ত্রী বিশাখাকে দেখতে আসত। প্রখর গ্রীষ্মে শীতকালের সব্জী খাইয়ে বিশাখা তার যত্ন-আত্তি করত। সঙ্গীত প্রেমিক তার বাড়ির কথা বলত, মার কথা বলত, বাবার লাম্পট্যের কথা বলত।

আমি আর বিশাখা তাকে আমার বাড়িতে উঠে আসতে বলি। বোঝাই, আমার বাড়িতে উঠে এলে তার সঙ্গীত বিষয়ে জ্ঞানের পরিধি আরো বেড়ে যাবে। একটা ঘর সঙ্গীত প্রেমিককে ছেড়ে দিই আমরা।

একদিন সে সত্যি সত্যি চলে এলো আমাদের ফ্ল্যাটে। তখন সবে সন্ধে হয়েছে। দুই একটা তারা আছে আকাশে। দোতলার ব্যালকনি থেকে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে সে। রাস্তায় ট্রাম বাস আর মানুষের শব্দের মিলিত ঐক্যতান সমুদ্রের ঢেউ-এর মত ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে। অগণন মানুষ আর যানবাহনের তীব্র শব্দ সে কান পেতে শোনে।

আমার স্ত্রী বিশাখা দক্ষিণ খোলা সবচেয়ে ভাল ঘরটা সঙ্গীতপ্রেমিকের জন্য সাজিয়ে রাখে। দেয়ালে করে ফিকে গোলাপী রঙ। বেডসাইড টেবিলে রাখে তিব্বতী ছাইদানি। ঘরের এক কোণে আদুরী বিড়ালের মত রাখে টেলিফোন। এক পাশে কাচের বুককেসে নানা ধরণের বই। জানলার ধারে রাখে মেহগনি কাঠের পিয়ানো। পিয়ানোর উপর কাজ করা টেবিল ম্যাটে বিশাখার প্রিয় ফুলের গুচ্ছ। পিয়ানোর নিচে রেকর্ড প্লেয়ারের উপর এক ঝাঁক রেকর্ড। সেই রেকর্ডগুলো গভীর রাতে বিশাখা আমাকে বাজিয়ে শোনাতো। সেগুলো বাজলেই আমাদের যৌবন বয়সের ছবি ফুটে উঠত। বিশাখা এক খণ্ড মেঘের মত ভেসে ভেসে বেড়াত। আমি আর বিশাখা হাত ধরে স্লোমোশন চলচ্চিত্রের মত ধীর লয়ে হেঁটে বেড়াতাম।

সেই সময় প্রায়ই একটা স্বপ্নের ছবি আমার ঘুমন্ত চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠত। মনে হোত, আমার চারপাশে কারা যেন ফিস্ ফিস্ করে কথা বলে

চলেছে। সিঁড়ি বেয়ে অস্পষ্ট হলেও অসংখ্য লোকের উঠে আসার শব্দ আমি অনুভব করতাম। কারা যেন আস্তে আস্তে ঢুকে আমাদের ছোট্ট তিন ঘরের ফ্ল্যাটটাকে জনসমুদ্রে পরিণত করেছে। মানুষে থিক্ থিক্ করছে সাড়া বাড়ি। কেউ কেউ পিয়ানোর উপরে উঠে বসেছে, কেউ বা পাখার ব্লেডে বসে দোল খাচ্ছে বাঁদরের মত, কেউ আমাদের ডবল বেডের আরামপ্রদ বিছানাটাকে অধিকার করে নিয়েছে। সেই মানুষের ঢেউ দু হাতে মোকাবিলা করতে করতে আমি আর বিশাখা বেরিয়ে যাচ্ছি বাড়ি থেকে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখি মানুষের সেই দীর্ঘ অজগর আমাদের চিনতে পারছে না। আমরা অনায়াসে লোকের ভিড়ে মিশে গিয়ে আমাদের বাড়ির ভেতরে ঢুকতে চেষ্টা করি। আশ্চর্য, কেউ আমাদের চিনতে পারে না। আমরাও আর সবার মত ঠেলতে ঠেলতে আমাদের শূন্য ফ্ল্যাটে ঢোকবার জন্য যা যা দরকার তা করতে থাকি। আমাদের সঙ্গে থাকে দলবদ্ধ মানুষ, সঙ্গে নারী ও সবে হাঁটতে শেখা শিশুর দল।

ছট-ফট করতে করতে সে স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। আমার পাশে বিশাখা ঘুমোয়। তার কপালে গয়নার মত ঘামের রেখা থাকে। কেবল মশারীর দেয়ালে মাথা কোটে দুই একটা পুরুষ্টু মশা।

কিন্তু সঙ্গীতপ্রেমিক আসার পর থেকে আমাদের বদলে যায় সবকিছু। বিশাখাকে আমি কাছে পাই না বেশিক্ষণ। ওই লোকটার তদারকিতেই তার দিন কাটে। ধীরে ধীরে আমাদের সংসারের সবকিছু যেন গ্রাস করে নিতে চায়। আমাদের বাড়ির সবকিছুকে সে ঘৃণা করতে সুরু করে যেন। আর কখনো সে বাইরে বেরোয় না। যায় না কোনো গানের আসরে। খবরের কাগজ পড়তে তার বিষম বমি পায়। দর্শন কিংবা বিজ্ঞানের বইগুলোর ছাপা লাইনগুলো তার কাছে উদ্ভট বিষয় বলে মনে হয়। সঙ্গীত বিষয়ে সে উদাসীন হয়ে পড়ে ক্রমশ। সঙ্গীতই তাকে অসুস্থ করে তুলছে—এরকম একটা অনুভূতি সে প্রকাশ করে।

পিয়ানোতে ধুলো জমে। পিয়ানোর জমে থাকা ধুলো পরিষ্কার করতে বিশাখার কসরৎ হয়। পিয়ানোর নিচে রাখা অ্যান্টিক রেকর্ডগুলো চিড় খায়। পিয়ানোর উপরে রাখা ফুলের গুচ্ছ সঙ্গীতপ্রেমিক জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় ফুটপাথের ময়লা বিনে। পিয়ানোর চাবিগুলো হয়ে গেছে হলদে। চাবি টিপলে একটা নাছোড় বেসুরো আওয়াজ ভেসে আসে। বই ভর্তি বুককেস দালানে সরিয়ে ফেলে সে। তার জায়গায় আনে একটা লজ্ ঝর এস্রাজ। গদিমোড়া

আরামকেদারা সরিয়ে সেই জায়গায় রাখে তার-ছেঁড়া বেহালা। দেয়ালে আমার আর বিশাখার যুগল ছবি নামিয়ে সেই পেরেকে ঝুলিয়ে দেয় প্লেকট্রাম গীটার। ফ্যানের ব্লেডে জড়িয়ে রাখে এক জোড়া পেতলের মন্দিরা। নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রের ভেতর আমাদের সঙ্গীতপ্রেমিক রাজার মত দর্পিত ভঙ্গিতে হেঁটে বেড়ায়। তার ঘরের দরজা এখন সারাদিন বন্ধ থাকে ভেতর থেকে। দরজার কড়া নাড়লে দরজা অল্প একটু ফাঁক করে খাবারের থালা টেনে নেয় সে। খাবার দিতে দেরি হলে তার হম্বিতম্বি আমরা শুনতে পাই। চাবির ফুটো দিয়ে দেখি সমস্ত জানলা বন্ধ করে দিয়ে সে একাকী বসে আছে। সমস্ত বাদ্যযন্ত্রের উপর পিতার মমতায় হাত বোলায় সে। গাল রাখে। তার চোখ থেকে এক ফোঁটা জল পড়ে পিয়ানোর ধুলোয় মাখা মাখি হয়। টেলিফোনের তার ছিঁড়ে ফেলে বাইরের সমস্ত সংযোগ সে ছিন্ন করে। তাকে এখন বেশ খুসি খুসি মনে হয়। টেলিফোনের বাজনা, মোটর গাড়ির শব্দ, জ্যান্ত মানুষের কোলাহল সমস্ত কিছুর থেকে সে এখন অনেক দূরে। দিনে দিনে সে প্রকৃত সঙ্গীতপ্রেমিক হয়ে ওঠে। নিঃশ্চুপ বাদ্যযন্ত্রগুলির গায়ে কান রেখে সে সঙ্গীতের স্বর শোনার চেষ্টা করে। সে যেন কিছু একটা পেয়েছে এমন দ্যুতিময় মনে হয় তাকে। গভীর মরণ কুয়োয় পাক খেয়ে বেড়ানো বাইক আরোহীর মত দ্রুত অথচ নিখুঁত কসরতে ঘরের চারপাশে পাক খায় সে। পাক খেতে খেতে তার বয়স বাড়ে। গাল ঝুলে পড়ে। টাক বড় হয়। সাদা ঝুলপি মাথাকে গ্রাস করে নেয়।

আমার আর বিশাখার মধ্যে কথা কমে যায় ইদানীং। সঙ্গীতপ্রেমিকের দেখ্ ভাল করবার জন্য বিশাখা ব্যস্ত থাকে সারাদিন। সন্ধ্যা সকাল ঠিক-ঠাক খাবার পৌঁছে দেয় তাকে। বাজার থেকে হিম লেগে থাকা টাটকা সব্জী নিয়ে আসে সঙ্গীতপ্রেমিকের জন্য। আনে তাজা কালো জাম, ঠাণ্ডা আঙুর আর মাংসময় আলফাঁসো।

দিন দিন বিশাখার চেহারা হয়ে উঠছে বেঢপ। দেখলেই বৌদি বলতে ইচ্ছে করে এমন স্নেহপ্রবণ। যৌন আবেদন কমতির দিকে। এককালের ঈষৎ সবুজ চকচকে ত্বক তার কোমলতা হারিয়েছে। বকবকুমরত পায়রার মত নেই কথার খৈ। সহোদর ভাই-বোনের মত আমরা পাশাপাশি শুয়ে থাকি বিছানায়। বিছানা একটা শব্দ মাত্র। কিন্তু অনুষঙ্গের কি ম্যাজিক। আমাকে আর বিশাখাকে এখন যে কেউ দেখলে বলবে যমজ ভাই-বোন। দুজনে দুজনের মত

দেখতে হয়ে যাচ্ছি দিনের পর দিন। আমার উপাধিটুকু কেবল ব্যাঙাচির লেজের মত বহন করে আছে সে।

কয়েকদিন হোল সঙ্গীতপ্রেমিকের ঘর থেকে কোনো আওয়াজ আসছে না। একদিন রাত্রে তার ঘর থেকে পচা গন্ধ ভেসে আসতে দেখে, আমি আর বিশাখা চাবির ফুটোতে চোখ রেখে সেই সুষমাময় দৃশ্য অবলোকন করি। বিশাখার গরম নিঃশ্বাস আমার ঘাড়ে পড়ে, আমি টের পাই।

কদর্যভাবে মেঝের উপর শুয়ে আছে আমাদের সঙ্গীতপ্রেমিক। তার শরীরে ছড়িয়ে আছে মায়াবী জ্যোৎস্না। তার পেটটা উঠেছে ফুলে। নিঃশ্বাসের নিয়মিত তরঙ্গ স্তব্ধ। কানের ফুটো দিয়ে অজস্র পিঁপড়ের সারি মিছিল করে ঢুকে যাচ্ছে ভেতরে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে পিঁপড়েরা তার শরীর ছেয়ে ফেলবে। এত বড় সঙ্গীতপ্রেমিককে তারা মান্য করবে না।

আমি আর বিশাখা সঙ্গীতপ্রেমিকের অটুট শবদেহকে ঘরের বাইরে আনি। আমরা জানি না সে কি জাতি। তাই তার মৃত শরীরের উপর সমস্ত বাদ্যযন্ত্র সাজিয়ে রেখে আমরা মৃতদেহ ফেলে পালিয়ে এসে আর এক জায়গায় এসে আস্তানা গাড়ি।

স্বপ্নে দেখা দৃশ্যের মত হাতে হাত মিলিয়ে আমি আর বিশাখা পালাতে থাকি। সবুজ ফসলে ঢাকা মাঠের উপর দিয়ে হালকা হাতে সাবানের ফেনার মত বরফের দেয়াল সরাতে সরাতে এগিয়ে যাই। হাজার হাজার মানুষ পিঁপড়ের মত সার দিয়ে আমাদের ছেড়ে আসা বাড়ির মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে অবিরাম। তাজা মানুষের কোলাহল সঙ্গীতের মত বেজে উঠছে যেন।

সঙ্গীতপ্রেমিকের অন্ত্যেষ্টির সময় সবাই জানতে পারবে সে বড় সঙ্গীতপ্রেমিক ছিল। তাতে সঙ্গীতের কোনো হেরফের হবে না। বাদ্যযন্ত্র সুরে বাঁধা না হলে চিরদিনই তাকে মানুষ বলবে বেসুরো।

সিদ্ধার্থর গৃহত্যাগ

অন্যান্য দিনের ভোরের সঙ্গে সেদিনের ভোরের কোন তফাৎ ছিল না। কলকাতার যে কোন অঞ্চলে যেভাবে ঢিমেতালে দিন শুরু হয় তেমনি ভাবেই টালিগঞ্জের এই গলিটায় দিন সুরু হলো। কোন আলোড়ন কোথাও নেই। খবরের কাগজের খবর হবার মত কোন বৈশিষ্ট্যই নেই এই এলাকার। সিদ্ধার্থ প্রায় একবছর টানা খোঁজাখুঁজির পর হঠাৎই দু-কামরার এই ছোট্ট ফ্ল্যাটটা লটারী জেতার মত পেয়ে যায়। দোতলার ঘর বলে ঘরে হাওয়া খেলে বেশি। দক্ষিণ দিকে গোটাকয়েক খুপড়ি চালের বাড়ি থাকার ফলে আকাশটাকে জানলা দিয়ে দেখা যায়। সিদ্ধার্থের একহারা ফ্ল্যাটটা দারুণ পছন্দ হয়। দোলনকে সে যতটুকু চেনে তাতে দোলনকে বিয়ে করে এখানে এনে তুললে দোলনেরও ভাল লাগবে—এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয় সে।

সিদ্ধার্থ বেডরুমের চার জালনায় নীল পর্দা লাগায়। দেয়াল জুড়ে একদিকে নিসর্গদৃশ্য ঝুলিয়ে দেয়। নীল সমুদ্রের ধারে সবুজ কলাপাতা রঙের ঝাউগাছ। আকাশে উড়ে যাচ্ছে এক ঝাঁক দুধ সাদা সী-গাল। সেই দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে সিদ্ধার্থের মনে হয় জীবনটা কি দারুণ একটা পাওয়া। দোতলায় দুঘরের ফ্ল্যাট, জানলায় নীল পর্দা, দেয়ালে টাটকা নিসর্গ দৃশ্য। আর কিছুদিনের মধ্যেই দোলন তার। মানে দোলনের সব তার।

সিদ্ধার্থ ধীরে ধীরে ঘর দুটোকে দোলনের বাসযোগ্য করে তোলে। মনে মনে কল্পনা করে, দোলন দুবেণী ঝুলিয়ে হাল্কা হাউসকোট পরে ঘরের ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছে। ষ্টিরিয়োতে মৃদুভাবে বাজছে আকাশ ভরা…। বইয়ের আলমারির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে কোন একটা প্রিয় কবিতার বই খুঁজে বেড়াচ্ছে দোলন। দোলনকে পেছন থেকে বড্ড সুন্দর দেখাচ্ছে। দোলনের ঘাড়ে একটুকরো ময়লা নেই, পায়ের পাতায় ধুলো নেই। যেন সে দোলন নয় অন্য কেউ।

সিদ্ধার্থ দোলনের জন্য কেনা ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়ায়। আয়নার উপর লেগে আছে কোম্পানীর লেবেল। চকচকে কাঠের পালিশের আবছা রঙের গন্ধ নাকে এসে লাগছে। সিদ্ধার্থ লক্ষ্য করে, আয়নায় তার

চোখের নিচে কালি পড়েছে। সিদ্ধার্থ ঠিক তখনই আবিষ্কার করে আজ তার জন্মদিন। অফিসে একটা টেলিফোন সে পাবেই। টেলিফোনে শিশুর মত ব্যবহার করবে দোলন। হয়তো অভিমানী স্বরে ঝগড়াও করবে। সন্ধ্যায় দেখা করতে বলে একটা আফটার শেভ লোশনের শিশি এনে বলবে, 'নাও ধর'। সিদ্ধার্থ কপট ভঙ্গিতে বলবে, 'হঠাৎ!' কব্জিতে দারুণ একটা চিমটি কেটে দোলন বলবে, 'ন্যাকা'। হো হো হাসিতে ফেটে পড়বে সিদ্ধার্থ। রাস্তার লোকজন ঈর্ষিত দৃষ্টিতে দেখবে তাদের। ওদের অহঙ্কার মানুষের শরীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগিয়ে যাবে।

সিদ্ধার্থ ক্যালেণ্ডারের পাতার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে এটা হেমন্তকাল। আশ্চর্য সিদ্ধার্থ এতদিন জানতই না তার জন্মদিন হেমন্তকালে। হেমন্তকাল কলকাতায় কখন এসে চলে যায় বোঝাই যায় না। শরৎ কালের পর যেন একলাফে শীতকাল এসে পড়ে। শীত কালে দোলনকে ভাল দেখায় না। দোলনের ত্বকে কমে যায় মসৃনতা। দোলনের গায়ে ওঠে পশমের সবুজ কার্ডিগান। শীতকালে যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়। চাকরী যায় লোকের। দম্পতিরা যে যার ঘরে ঢুকে পড়ে সন্ধ্যারাত্রিতে। বাচ্চারা ঠাণ্ডায় সর্দি বাঁধিয়ে বসে। চীনভারত যুদ্ধ সুরু হয় বাষট্টির শীতে।

সিদ্ধার্থ ভাবে আর কিছুকাল পরেই এসে যাবে শীত। শীতের কলকাতা ভরে যাবে কমলালেবুতে। এসপ্লানেডে আর কিছুদিনের মধ্যে কিমোনো পরা ভুটিয়া মেয়েরা পশমের পোষাক নিয়ে চলে আসবে। গাছের পাতাগুলো ঝরে পড়বে। কেমন করে যে গাছ পাতা ঝরায় খেয়াল রাখে না কেউ। হঠাৎ দেখা যায় একটাও পাতা নেই।

সিদ্ধার্থ হিসেব করে তার জীবনে শীতকাল কবে আসবে। তার শরীরে শীতের চিহ্নগুলি কবে প্রথম দেখা দেবে। সিদ্ধার্থ চোখের কোলটা টেনে চোখের সজীবতা লক্ষ্য করে। তারপর দক্ষিণের জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকায়। হঠাৎ এই আজকের দিনেই তার নিজের অন্ত্যেষ্টির কথা মনে পড়ল সিদ্ধার্থর। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে দোলনকে বিয়ে করবার আগেই হয়তো পৃথিবী থেকে চলে যেতে হবে তাকে। ঠিক সেই সময় কাগজ পাকিয়ে, দড়ি বেঁধে কাগজঅলা সেদিনের কাগজ ছুঁড়ে দেয়। কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় নানা খবর। ভারত কোথায় কোথায় উন্নতি করেছে তার ফিরিস্তি। জিনিষ পত্রের দাম বেড়ে যাওয়ার বিবরণ। ময়দানে সরকারের বিরুদ্ধে বিশাল জমায়েত।

ভেতবেব পৃষ্ঠায় খেলাব খবব। শোক সংবাদ। শোক সংবাদ দেখলে বিরক্তি লাগে সিদ্ধার্থব। সঙ্গেব ফটোগ্রাফ দেখলে হাড-পিত্তি জ্বালা কবে। সিদ্ধার্থ কাগজটা ভাঁজ কবে বেখে দেয। খববেব কাগজে যে মানুষ কি পায।

দোতলা থেকে বাজাব দেখা যাচ্ছে। গ্রামেব চাষী বউ নানা শাক-সব্জী নিয়ে পসবা সাজিয়ে বসে আছে। দুধেব বুথেব সামনে মানুষেব লম্বা অজগব। বাজাবে গিজগিজ কবছে ভিড। বেলা বাডলেই বাজাব শূন্য হয়ে যাবে। লোক-গুলোকে খুঁটে খুঁটে তুলে নিয়ে যাবে কে।

তখনই সিদ্ধার্থব মনে পডলো আজ দোলনকে খেতে বলতে পাবে সে। তাকে নিজে বান্না কবে টেবিল সাজিযে খেতে হবে না আজ। আজ এই বিশেষ দিনে দোলনেব সামনে বসে সে চিকেন তন্দুবী খাবে। তাবপব নির্জন ঘবে একা পেয়ে জন্মদিনকে সেলিব্রেট কবতে দোলনেব লালাসিক্ত ঠোঁটে এঁকে দেবে চুম্বন। কেন সে টেলিফোন কববে না দোলনকে ?

সিদ্ধার্থ জানলা দিয়ে নিচে তাকায়। চায়েব দোকানে সেই বুড়ো লোকটা ঠিক এসে বসে আছে বোজকাব মতই। আপনমনে বাস্তাব দিকে তাকিয়ে দেখে যাচ্ছে বাস্তাঘাট। গাল তুবডে গেছে লোকটাব। বুডোটাব চাবপাশে বাজনীতি নিয়ে তুমুল হৈ-হল্লা। স্বাধীনতাব আগে জিনিষপত্রেব দাম কত কম ছিল—এই নিয়ে হা হুতাশ কবে কেউ। বুডোটা নিশ্চুপ। মাঝে মাঝে চুমুক দেয় চায়ে। শীত পডাব আগেই গলায় কমফবটাব জডায়। বসে থাকে নটা অবধি। কারুব কৌতূহল জাগিয়ে তোলে না কখনও। কোন কোন দিন পনেবো মিনিট বেশি থাকে আবো। কেন যে থাকে কেউ জানেনা। বুডো-টাকে নিয়ে কোনদিন কেউ ভাবে না। বুডোটাও কি কাউকে নিয়ে ভাবে। অথচ মাঝে মাঝে চায়ে চুমুক দেবাব কথা ভুলে যায় বুডোটা। প্লেটে চা পডে থাকলে বিবক্ত হতে তাকে দেখেছে সিদ্ধার্থ। সিদ্ধার্থব ইচ্ছে হয় চায়েব দোকানেব লোকটাকে ঘুষ দিয়ে বোজই ওব প্লেটে কিছু চা ফেলে রাখে। এত নিরুত্তাপ লোক দেখলে বড অস্বস্তি হয় সিদ্ধার্থর। লোকটিকে একই সঙ্গে অতি তুচ্ছ ও অপাব শক্তিধব মনে হয় তার।

বাস্তার দিকে তাকায় সিদ্ধার্থ। চঞ্চল কিছু মানুষ প্রয়োজনে হেঁটে যাচ্ছে। বাস স্টপে ভরা মেঘেব মত এক যুবতী। আকাশ নীল। রোদ্দুর ঠিকরে পড়ছে মোমপালিশ করা গাড়ির গায়ে। সিদ্ধার্থর মনে হল তার। কত সহৃদয়। ইচ্ছে করলো, এক্ষুনি সবাইকে ডেকে নিয়ে আসে নিজের ঘরে। আদর করে

চিকেন তন্দুরী খাওয়ায়। খাওয়ার শেষে দোলনের গান শোনায় তাদের। তারপর বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে ইংরাজী কায়দায় বলে, গ্ল্যাড টু মিট য়্যু।

কিন্তু সিদ্ধার্থ জীবনে কোনদিন কিছু ঘটাতে পারে নি। চেষ্টা করেও পারেনি দারুণ একটা ঘটনা ঘটিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতে। এমনকি জামা-কাপড়েও কোন বিপ্লব আনতে পারেনি। ইচ্ছে করলেও পারেনি রঙীন ডিসকো আর আকাশী নীল জিন্‌স পরতে। বড় হল ঘরের মধ্যে হাঁটতে পারেনি বুক চিতিয়ে। তার জীবনে দোলনই একমাত্র ঘটনা। মাঝে মাঝে সিদ্ধার্থ ভাবে, এমন একটা সকাল কিংবা সন্ধ্যা আসুক যা তার পাল্টে দেবে সারাজীবন অথচ কিছুই ঘটে না। তার প্রতিটা দিন বিরক্তিকরভাবে একরকম। তবে দোলন এলে তার ভাল লাগে। দোলনের সঙ্গে কথা বলতে পেরে তার খুব আনন্দ হয়।

ঠিক সেই সময় মৃতদেহটাকে বয়ে নিয়ে যেতে দেখে সিদ্ধার্থ। জানলার নিচে মানুষের জটলা। মানুষগুলোর মুখ থমথমে। চারটে এক মাপের মানুষ মৃতদেহটাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মৃতদেহের শরীর ফুলে ঢাকা। চোখদুটো আধবোজা। আশ্চর্যভাবে লক্ষ্য করলো লোকটা সবে চুল কেটেছে। গোঁফ-দুটো সুন্দরভাবে ছাঁটা। লোকটা কি জীবনকে ভালবাসতো। লোকটা কি মৃত্যুকে ভয় পেতো না! নাকি মৃত্যুকে এড়িয়ে চলতো সে। লোকটার কামানো গালের পাশে একটা নীল বড় ধরণের মাছি কেবলই উড়ছে। সিদ্ধার্থর ইচ্ছে হয়, কাউকে ডেকে বলে, মাছিটা উড়িয়ে দিন দাদা।

হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলকের মত লোকটাকে মনে পড়ে সিদ্ধার্থর। কদিন আগেই লোকটার সঙ্গে কথা বলেছে সিদ্ধার্থ। মোড়ের মনিহারী দোকানটায় তাকে প্রায়ই বসে থাকতে দেখেছে সে। লোকটা তার চেনা অথচ সে এতক্ষণ চিনতে পারছিলো না ভেবে সিদ্ধার্থ অবাক হয়।

লোকটা খেলা ভালবাসতো। ভালবাসতো ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবকে। ভাল-বাসতো পূর্ববঙ্গের ভাষাকে। কথার তোড়ে সবাইকে হারিয়ে দিতে ভালবাসতো। ইষ্টবেঙ্গল খেলায় জিতলে পাড়ার অন্ধ ভিখারীকে নিমেষে পাঁচটাকা দিয়ে দিত। সেদিন রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া চলতো। দুই একদিন সিদ্ধার্থকে ডেকে নিয়ে খাইয়ে দিয়েছে লোকটা। বড় আমুদে ছিল লোকটা। লোকটা কাল বিকেলেও জানতো না তাকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। জানলে কখনও চুল কাটতো না। গোঁফ ছাঁটতো না অমন আধুনিক কায়দায়।

অথচ সিদ্ধার্থর ঠাকুর্দা যখন মারা যান ক্রমেই যেন ছোট হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। অমন প্রতাপশালী লোকটা হিশি চাপতে পারতেন না। কোন চেনা-জানা মানুষকে ঠাহর করতে পারতেন না। যখন মারা যান ওই ছ ফুট মাপের দশাসই চেহারাটাকে চেনাই যাচ্ছিলো না। যেন একটা বড়-সড ওরাং ওটাং। সিদ্ধার্থ তখন থেকেই ভাবতে চেয়েছে, মৃত্যুতে ক্ষতি কার? মৃত্যুতে ক্ষতি তারই যে এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে চেয়েছিল।

সিদ্ধার্থ অনেকদিন ভেবেছে, তার হওয়া উচিৎ এমন লোক যে তাশ খেলতে জানে। ট্রেনে কিংবা পার্টিতে অনায়াসে যে চতুর্থ খেলোয়াড় হতে পারে। হেঁটে যেতে পাবে সেদিকে যেদিকে সে হেঁটে যেতে চায়। মানুষের সঙ্গে খুব সহজে কথা বলে। রাস্তায় খুব ভাল জাতেব কুকুর কাউকে নিয়ে যেতে দেখলে সে অনায়াসে কুকুরের বংশ তালিকা বলে দিতে পারে। বন্ধুদের আড্ডায় যে কোন বিষয় নিয়ে কথা-চালাচালি কবতে পারে। ধীবে ধীবে সিদ্ধার্থর সে-সব লোকেদেব একজন হওয়া উচিৎ যাদের বিজয়ার দিন একটু সিদ্ধি খেতেই হয়। মেয়েদেব সঙ্গে কথা বলাব সময় যাদের গলার স্বর অন্য রকম হয়ে যায় সিদ্ধার্থ তাদের একজন হতে চেয়েছে। বাসে উঠে কখনও ভাবেনি অন্তত দশটি মহিলার ঠোঁটে সে চুমু খেতে পাবে। মুক্তাকাশ বিচিত্রানুষ্ঠানে হঠাৎ আলো কিংবা মাইক স্তব্ধ হয়ে গেলে সে ধর্ষণভীতা রমণীদের দিকে তাকিয়ে তাদের করুণা করেছে। শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়েছে সিদ্ধার্থ। শুভঙ্কর-এর অঙ্কেব মত কিছুই শেষ পর্যন্ত মেলেনি। তবে অনেক কিছু দেখে শুনে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে: বেঁচে থাকার আয়োজনেই তাকে টিকে যেতে হবে আমৃত্যু। যেমন পিঁপড়েরা টিকে থাকে।

ঠিক তখনই সিদ্ধার্থ ভাবে এমন প্রয়োজনহীন ভাবে বেঁচে থাকা নিরর্থক। আত্মহত্যার মত চমক লাগানো কিছু করতেও তার মন চাইল না। ভারবাহী জন্তুর মত জীবনটাকে বয়ে নিয়ে যাবার কথা ভাবতেই তার হাসি পেল আর বড মমত্ব নিয়ে দুঘবের ফ্ল্যাটটার চারপাশে তাকালো। দোলনের জন্য কেনা বড আয়নায় দেখল নিজেকে। আয়নায় তাকে বড করুণ আর অসহায় দেখাচ্ছে। হেমন্তের এই রকম এক সকালে সে জন্মেছিল। গ্রামের এক অশিক্ষিতা ধাত্রী বড় অস্বাস্থ্যকরভাবে সিদ্ধার্থকে মা'র শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল আজ থেকে তিরিশ বছর আগে। সেদিন সে মরতে পারতো। কিন্তু মরেনি। মরে গেলে পৃথিবীর কি কোন ক্ষতি হতো? বেঁচে থেকেই বা কি লাভ হয়েছে সিদ্ধার্থ'র।

সিদ্ধার্থ টেবিলের উপর থেকে পার্সটা তুলে নেয়। কয়েকটা দশ টাকার

নোটের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটা লটারীর টিকিট। নম্বর জে এ ৭২০৬৯১। কাল বিকেলেই বি-বা-দী বাগ থেকে কিনেছে টিকিটটা। সামনের শনিবারই খেলা। প্রথম পুরস্কার পেলে কি কি করবে কালই ঠিক করে রেখেছিল সে। কিন্তু আজ সে সব মনে নেই তার। সিদ্ধার্থ জেড এ ৭২০৬৯১ টিকিটটা বের করে। হালকা গোলাপী রঙের লম্বাটে টিকিট। সিদ্ধার্থ টিকিটটা মাঝখান থেকে ছিঁড়ে ফেলে দু আঙুল দিয়ে। তারপর আড়াআড়িভাবে আর একবার। তারপর আরো। ক্রমাগত আরো। কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে টিকিটটা সিদ্ধার্থ। জানলা দিয়ে কাগজের টুকরোগুলো ছুঁড়ে দেয়। কাগজের টুকরোগুলো বাতাসে দুলতে দুলতে নিচে নামতে থাকে। এবং সেই মুহূর্তে সিদ্ধার্থ ঠিক করে সে এ সংসার ত্যাগ করবে। দোলনকে ত্যাগ করবে। কোন কিছুর প্রতি আর সিদ্ধার্থ আকর্ষণ বোধ করে না। সেখানে দোলন তো সামান্য এক নারী মাত্র।

সিদ্ধার্থ'র মানসিক অবস্থা তার তিরিশতম জন্মদিনে যখন এমনি তখন দোলন এলো। হেমন্তের হলুদ সকালে দরজার বাইরে হলুদ শাড়ি পরে দোলন দাঁড়িয়ে। দোলনের পায়ে হলুদ রোদ্দুর। রোদ্দুরে পা চুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দোলন। দোলনকে কি ডাকবে সিদ্ধার্থ? পিঠে হাত রেখে আদর করে ডেকে আনবে ঘরে? না তার সিদ্ধান্ত তাকে জানিয়ে দেবে সে। দোলন হাসছে যেন। দোলনের শরীরের উপত্যকায় জমে আছে মেঘ। আহ্ কি ঠাণ্ডা বাতাস ধেয়ে আসছে দরজা দিয়ে। যেন দেয়াল জোড়া সমুদ্র এখনি গর্জে উঠবে। ঢেউ-এর মাথাগুলো এখনি সাপের ফণার মত নাচতে নাচতে এগিয়ে আসবে। দুধ সাদা সী গালের ঝাঁক পাখা ঝাপটে উড়ে যাবে আরো দূরে।

সিদ্ধার্থ দোলনের দিকে তাকায়। দোলনের চোখের তারা তিরতির করছে। চোখের পাতা পড়ছে একটু ঘন ঘন। দোলন যেন কত দীর্ঘ পথ পার হয়ে এসেছে তারই জন্য। দোলনের চোখের ভেতর টলটল করছে দুটো মুক্তো। সিদ্ধার্থ কি কাছে যাবে তার। চোখের মুক্তো দুটো পরম মমতায় ধরে রাখবে তার দুহাতের অঞ্জলিতে। পরমুহূর্তেই সিদ্ধার্থ নিজেকে খুঁজে পায়। চিবুক দৃঢ় হয় তার, চোখ হয় স্থির, উত্তেজনায় তার বুক ওঠানামা করে। জানলা দিয়ে অগণন মানুষের হেঁটে যাওয়া দেখতে দেখতে সিদ্ধার্থ তার গৃহত্যাগের সিদ্ধান্তে অটল থাকে।

এগিয়ে যায় সিদ্ধার্থ দরজার দিকে। অন্তিম মুহূর্তে আর একবার ঘরের

আসবাবপত্রের দিকে তাকায়। আর কিছুক্ষণের মধ্যে সে সর্বত্যাগী হবে। হেমন্তের এই সুন্দর সকালে সে তার প্রিয় সবকিছু এক লহমায় জীর্ণ বল্কলের মত ছেড়ে যাবে। সিদ্ধার্থ যখন মানসিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে ফেলেছে তখনই দেখে ফ্ল্যাট থেকে বের হবার সমস্ত দরজাতেই দোলন দাঁড়িয়ে। দোলনকে কি বলবে কিছুই ভেবে পায় না সে। মনে মনে দোলনকে বলবার একটা যুৎসই উত্তর খুঁজতে থাকে। হেমন্তের এক সুন্দর সকালে কেন সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগের মত এক চরম সিদ্ধান্ত বেছে নিল তার কোন আপাতকারণ সে খুঁজে পেলো না। চাকুরে সিদ্ধার্থ, প্রেমিক সিদ্ধার্থ আর বিষয়ী সিদ্ধার্থের এ রকম হঠকারিতা বেমানান। তাই সে দোলনকে কিছুই বলতে পারলো না। স্বাভাবিক নিয়ম মানা মানুষের মত দোলনকে নরম স্বরে ডাকলো।

সিদ্ধার্থ ভাবলো, সে যদি আমরণ চেষ্টা করে তাহলেও কি এই ঘর দুটো সে ত্যাগ করে চলে যেতে পারবে। ঘরের চারদিকের দেয়াল ক্রমাগত ছোট হয়ে আসছে সিদ্ধার্থর চোখের সামনে। দরজার সামনে দোলন। সিদ্ধার্থ আর বাইরে বেরুবার চেষ্টা করে না। চেষ্টা করলেও সে পারবে না। কিংবা বেরিয়ে গেলেও ফিরে আসতে হবে। তারপর থেকে আর কোনদিন সিদ্ধার্থ নিয়মছাড়া পথে চলেনি। তাশের খেলায় চতুর্থ ব্যক্তি হবার জন্য তাশ খেলা শিখেছে। যেখানে 'প্রস্রাব করিয়ো না' লেখা সেখানে ছাড়া কোথাও পেচ্ছাব করে নি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফিরে এসেছে নিয়মমত। কারণ সে জেনে ফেলেছে, গৃহ তো ফিরে আসার জন্যই।

সমুদ্রের নিচে দাঁড়িয়ে দোলনকে বড় মমতায় আবার ডাকলো সিদ্ধার্থ : দোলন।

দোলন ঘরে ঢোকে। ঘরের দুঃস্বপ্ন ভেঙে যায়। ব্যথায় সিদ্ধার্থের গলা বুজে আসে। ব্যথাটা কেন সিদ্ধার্থ কিছুতেই বুঝতে পারে না।

নিনির প্রেমিক

নিনির একজন গোপন প্রেমিক আছে। আমি যখন ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাই, তখন কেন জানি মনে হয়, আমার বুকের মাঝখানে থেকেও ও আরেক পুরুষের কথা ভাবে, আরেকজনের কথা চিন্তা করে। যখন আমরা ঘনিষ্ঠ হয়ে গল্প করি, কথা বলি, তখন হঠাৎ হঠাৎ ও অন্যমনস্ক হয়ে যায়। তখন নিনি ওর প্রেমিকের কথা ভাবে।

অথচ যখন ওর কলেজ-এর গেট দিয়ে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে সবুজ এক :বদ্রিকা পাখির মত নিনি বের হয়, দূর থেকে ওকে দেখতে পেয়ে আমার বুকের মধ্যে হাইহ্যাটস বাজতে থাকে। জন্মদিনে আমারই দেয়া ঝুটো মুক্তোর মালায় চোখ আটকে যায়। আমার কনুই ছুঁয়ে নিনি লীলায়িত ভঙ্গিতে হাঁটে। কলেজের কথা বলে। কোন কথাটা আগে বলবে তার জন্য হাঁস ফাঁস করে। দারুণ এক খবর শোনাবার জন্য ঠোঁট দুটো সাপের মত কিলবিল করে নড়ে ওঠে। অথচ অনায়াসে সেই সময় ওর প্রেমিকের কথা ভাবতে পারে নিনি।

আমি জানি, ওর প্রেমিক আমার চেয়ে লম্বা, আমার চেয়ে ফর্সা, আমার চেয়ে পুরুষালি, আমার চেয়ে স্মার্ট, আমার চেয়ে বেশি যৌন আবেদন ময়। নিনির প্রেমিকের টাউজার্সের কাটিং আমার চেয়ে আধুনিক। নিনির প্রেমিকের পকেটে ইণ্ডিয়া কিং-এর প্যাকেট থাকে সবসময়। থাকে সুদৃশ্য গ্যাস লাইটার।

নিনির প্রেমিকরা কলকাতার বনেদী পরিবার। ওদের নিজস্ব মোটর গাড়ি আছে। আমি জানি, আমার অজান্তে নিনি ওর প্রেমিকের সঙ্গে বেড়াতে যায়। নিনির প্রেমিক গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়ায়। সম্রাজ্ঞীর ভঙ্গিতে নিনি গাড়িতে উঠে যায়। গাড়ির গদি মোড়া চেয়ারে নিনি গা এলিয়ে দেয়। নিনির প্রেমিক তার পুরুষ্টু ডান হাত নিনির মাথার উপর দিয়ে ছড়িয়ে দেয়।

মাঝে মাঝে ভাবি, নিনির প্রেমিকের কথা নিনিকে বলব। তার ব্যভিচারের কথা তাকে জানাব। তাতে যা হয় হোক। তাতে যদি সম্পর্ক ভেঙে যায় যাক। আজ একটা হেস্ত নেস্ত করতে হবে। কিন্তু যখনই নিনি আসে নিনির শরীরের ঈষৎ নারীগন্ধে আমি উত্তেজিত হই। আমি আননার্ভস্ত হয়ে পড়ি। কিছু বলতে পারি না। কারণ নিনি আমার যৌন তৃপ্তিদায়িনী।

নিনি যখন রাস্তায় কোন পরিচিত পুরুষের সঙ্গে কথা বলে আমার ভীষণ ঈর্ষা হয়। ঈর্ষায় আমার বুক জ্বালা করে। কোন সুন্দর চেহারার যুবকের সঙ্গে কথা বলার সময় ওর গলার স্বর অন্য রকম হয়ে যায়। হাসবার সময় নিনি দাঁত ততটাই ফাঁক করে যতটা ফাঁক করলে ওকে সুন্দর দেখায়। মুহূর্তের মধ্যে নিনি অন্য এক নিনি হয়ে যায়। আমি নিনিকে চিনতে পারি না।

আমার তখনই মনে হয় ওই যুবকটিই নিনির প্রেমিক। আমি নিনির প্রেমিকের চেহারা খুঁটিয়ে দেখি। কোথায় কোথায় আমার চেয়ে সে সুন্দর লক্ষ্য করি। আমাব সঙ্গে আলাপ করিযে দিলে আমি কায়দা করে সিগারেট বের করি পকেট থেকে। তারপর সিগারেট ধরাবার জন্য চুপকেটে অহেতুক দেশলাই খুঁজতে থাকি। নিনির প্রেমিক পকেট থেকে গ্যাসলাইটার বের করে আমার সিগারেটের মুখে আগুন জ্বালে। আগুনের শিখাটা আমার বুকের মধ্যে জ্বলতে থাকে অবিরল।

নিনির দিকে তাকাই আমি। প্রেমিকেব সঙ্গে কথা বলার সময় নিনির বুকের আঁচল সরে যাব। নিনিব উপর আমার খুব বাগ হয় তখন। চোখের ইশাবা করে আমি নিনিকে শালীন হতে বলি। কেন জানি নিনি আমাকে ভ্রূক্ষেপ করে না। আমাকে দাঁড করিয়ে বেখে নিনি প্রেমিকের সঙ্গে সিনেমার গল্প করে। মাঝে মাঝে জলতবঙ্গেব মত হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে প্রেমিকের গা ছুঁয়ে যায়।

এক সময় কথা শেষ হলে নিনির প্রেমিক চলে যায়। দ্রুত রাস্তা পেরিয়ে ও ফুটপাথে যেতে চায়। ওদিক থেকে একটা দোতলা বাস ছুটে আসে। আমার কেন জানি মনে হয় নিনির প্রেমিক যেন বাস্তাটা পেরুতে না পারে। আমি কায়মনবাক্যে চাই দোতলা বাসটা ওকে থেঁতলে মেরে ফেলুক।

নিনিকে বলতে ইচ্ছে হয়: নিনি, তোমার চালচলন আমার ভাল লাগে না। বলতে ইচ্ছে হয়, নিনি, তোমার প্রেমিককে আমি খুন করব। বলতে ইচ্ছে হয়, নিনি, তোমার গোপন প্রেমের খবর আমি পেয়ে গেছি। মধ্যযুগ হলে আমি তোমার প্রেমিককে অসিযুদ্ধে নিশ্চয় হারিয়ে দিতাম।

কিন্তু নিনি যখন আমার কাছে এসে হেসে দাঁড়ায় আমার বুকের মধ্যে হাজার ডন জুয়ান জেগে ওঠে।

অথচ কত সহজে নিনি ব্যাপারটা গোপন করে আছে আমার কাছে। হাজার কথা বার্তার ফাঁকেও মুখ ফস্কে প্রেমিকের কথা বলে না নিনি। আমি

হাবে ভাবে ওকে প্রেমিকের কথা বলতে চাই। কিন্তু নিনি বুঝতে পারে না। আমি কায়দা করে ওকে অন্য ছেলেকে বিয়ে করতে বলি। নিনি শিশুর বিস্ময়ে আমাকে দেখে। তারপর কাঁদে। অনেকদিন দেখা করে না। আউট্রামের চেনা ফুচকাওলা দিদিমনির কথা জিজ্ঞেস করে। মাঝে মাঝে নিনির কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়। ওরা নিনির সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা তোলে। ঝগড়া মিটিয়ে ফেলতে বলে। সন্ধ্যেবেলায় বন্ধুদের আড্ডায় গেলে বন্ধুরা নিনির খোঁজ খবর নেয়। সিনেমা দেখতে গেলে রূপালী পর্দায় নিনির পর্দাজোড়া মুখ দেখতে পাই আমি। মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে আমি হঠাৎ নিনিকে দেখতে পেয়ে যাই। অচিরেই সারা কলকাতা নিনির প্রেমিক হয়ে পড়ে দ্রুত।

তখন আমার বুকের মধ্যে এক ভিনদেশী কষ্ট সুরু হয়। আমি ছুটে নিনির কাছে চলে যাই। নিনি তখন হো চি মিনের কবিতা পড়ে। নিনি আমাকে জ্যোৎস্নায় ভেজা গাছের মত আশ্রয় দেয়।

নিনির ঠোঁট দুটো আমাকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করে। নিনির তরতাজা ঠোঁটে চুমু খাই আমি। নিনির ঠোঁট দুটো আমাকে গ্রাস করে নেয়। ধীরে ধীরে নিনির ঠোঁট থেকে মুখে, তারপর গলা বেয়ে পেটের ভেতর এক সময় টুপ করে ঢুকে যাই আমি। নিনির অন্ত্র, পাকস্থলী আমার চোখের সামনে পূর্ণ অবয়ব নিয়ে স্পষ্ট হয়। পৃথিবীর সমস্ত পুরুষ মানুষের মতই আমি এখন নিরাপদ। নিনির প্রেমিক আমাকে আর তাড়া করে না।